পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহে বহিঃশক্তির ভূমিকা

এম.ফিল অভিসন্দর্ভ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক
মোঃ সাঈদুর রহমান
বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা)
ইউ.জি.সি. ফেলো
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

400848

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মার্চ, ২০০৩

M.Phil.

GIFT

400848

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহে বহিঃশক্তির ভূমিকা

এম.ফিল অভিসন্দর্ভ
মার্চ, ২০০৩

400848

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোঃ সাঈদুর রহমান
বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা)
ইউ.জি.সি. ফেলো
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তারিখ :

"প্রত্যয়ন পত্র"

জনাব মোঃ সাঈদুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহে বহিঃশক্তির ভূমিকা" শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১। এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।

২। এটি সম্পূর্ণরূপে জনাব মোঃ সাঈদুর রহমান এর নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম।

৩। এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষনা নিবন্ধের চূড়ান্ত পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

400848

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ডঃ মুঃ নুরুল আমিন
গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ফোন : ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪৪৬০ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩ ; E-mail : duregstr@bangla.net

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বাংলাদেশ একটি সমতলভূমির দেশ হলেও পাহাড়ি অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা ভূ-রাজনৈতিক, কৌশলগত এবং ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এই গুরুত্বের কারণে এবং পাব্যত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতিয়দের আলাদা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণে বিভিন্ন বহিঃশক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছিল। আমার এই গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদদ্রাহে যেসব বহিঃশক্তি সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন যুগিয়েছিল তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সমস্যাটিকে কেউ প্রভাবিত করতে পারে কিনা তা সামনে রেখেই এই অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে সর্বপ্রথম যাকে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টা জনাব অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম, সাহায্য, সহযোগিতা, উপদেশ, সমর্থন ও গঠনমূলক পরামর্শ আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

আমি আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষক মন্ডলীদের যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আমি স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে, যাদের সহযোগীতায় আমি গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সম্মানীত চেয়ারম্যান, সদস্য এবং ফেলোশীপ বিভাগের কর্মকর্তাদের যারা আমাকে ফেলোশীপ প্রদান করে ঋণী করে রেখেছেন।

আমি আন্তরিকতার সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পি.এইচ.ডি গবেষক, অরুন কুমার গোস্বামী, এম. ফিল গবেষক সৈয়দ আশরাফুর রহমান, বাদল হাওলাদার ও অন্যান্য সতীর্থদের যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ ও সহযোগিতায় আমি গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে উৎসাহ পেয়েছি।

আমি আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি আমার বন্ধুবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ এর সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম দীপু-কে যে আমার অভিসন্দর্ভটির ভাষাগত দূর্বলতা দূর করে, ঋণী করে রেখেছে।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নীলক্ষেত বাকুশাহ মার্কেটের সোহেলকে সে অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে কর্মকম্পিউটার কম্পোজ ও বর্ণবিন্যাস করতে সহায়তা করেছে।

সবশেষে আমার সহধর্মীনি রেবেকা সুলাতানা লিপি যে আমার কণ্যাদ্বয়কেও সংসারকে সামনে রেখে এই অভিসন্দর্ভটি শেষ করার জন্য উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছে।

মোঃ সাঈদুর রহমান।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি ভূ-কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বাঙালিসহ বিভিন্ন জাতীসত্তার উপস্থিতি এই অঞ্চলে দেখা যায়। তাছাড়া বৃহত্তম পাহাড় ও বনাবৃত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশ এবং মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ ভৌগোলিকভাবে যুক্ত। উভয় দেশের এসব প্রদেশগুলোতে দীর্ঘদিন যাবৎ সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। স্বাভাবতই তার প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর পড়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ এই অঞ্চলে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে এই অঞ্চলকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার করিডোর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গোপসাগরের দুরত্ব মাত্র ১২/১৩ কিঃ মিঃ। তাই সহজে জরুরী যে কোন প্রয়োজনে কক্সবাজারের উখিয়া দিয়ে বঙ্গোপসাগরে অবতরণ করা যায়। আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ভারতের আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা রাজ্যে সড়কপথে যোগাযোগ করা যায়। ভারতের এসব রাজ্যে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে এবং এলাকাটি ভূ-বেষ্টিত বিধায় ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর সব সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলনটা ভারতেরই তৈরি। এই সমস্যাকে ভারত বিভিন্ন কারণে জিইয়ে রেখেছিল। এমনকি শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভারতের হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর এশিয়ার উদীয়মান দুই শক্তি ভারত এবং চীন দক্ষিন এশিয়ায় তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলয়ে বাংলাদেশকে রাখতে চায়। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুটিকে তারা উভয়শক্তি অতীতে ব্যবহার করেছিল। ভবিষ্যতে এই ইস্যুটিকে উভয় শক্তি আবার ব্যবহার করলে বিচিত্র কিছু হবে না। সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং দাতা গোষ্ঠীসমূহ এই অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সাহায্য দিচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্থিক সাহায্যের আড়ালে এই অঞ্চলটিকে নিয়ে সুদুর প্রসারী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সাহায্য করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনসহ বিভিন্ন দেশী বিদেশী এন.জি.ও। অতি সম্প্রতিকালে এই অঞ্চলে তেল ও গ্যাস আবিস্কারের সম্ভবনা রয়েছে। আর তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বহুজাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানী পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময় তাদের কোম্পানিগুলোর স্বার্থ দেখে থাকে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলটিকে নিয়ে ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে জড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি কোম্পানী চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে একটি বেসরকারি টারমিনাল নির্মানে আগ্রহী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার সংলগ্ন এলাকায় বিশাল ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। মায়ানমারও বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুঃশ্চিন্তার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলাতে মায়ানমারের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘটাতে সহায়তা করতে পারে। অপরদিকে শান্তিচুক্তির পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে উপজাতিয়রা দুটি ধারায় বিভক্ত এবং উভয় গ্রুপ সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশের মত একটি ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে বহিঃশক্তির এসব প্রভাব মোকাবিলা করা সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ। বহিঃশক্তির এসব প্রভাব কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কীভাবে ঘোলাটে করতে পারে তা এই অভিসন্দর্ভটির মাধ্যমে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহে বহিঃশক্তির ভূমিকা

পৃষ্ঠা নং

প্রত্যয়ন পত্র I

কৃতজ্ঞতা স্বীকার II

মুখবন্ধ III

সূচীপত্র V

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র VII

১। ভূমিকা ১-৮

ক) গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
খ) গবেষণার পদ্ধতি
গ) গবেষণার গুরুত্ব
ঘ) গবেষণার সীমাবদ্ধতা
ঙ) গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ

প্রথম অধ্যায় ৯-১৪

২। উপজাতিয় সমস্যা এবং এই সমস্যা উদ্ভবের কারণসমূহ বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫-২৪

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ পরিচিতি ও জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ

তৃতীয় অধ্যায় ২৫-৩০

৪। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

চতুর্থ অধ্যায় ৩১-৪৮

৫। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা নীতির প্রয়োগ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর এর প্রভাব

পঞ্চম অধ্যায় ৪৯-১২৮

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহ বহিঃশক্তির ভূমিকার মূল্যায়ন।

(১) ভারতের ভূমিকা
- ক) ভারতের নিরাপত্তা নীতি
- খ) ভারতের ভূ-কৌশলগত স্বার্থ
- গ) শান্তি বাহিনীর সমর্থনে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতা
- ঘ) ভারতের ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ
- ঙ) শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভারতের ভূমিকা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার স্বার্থ
(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বার্থ
(৪) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবধিকার সংগঠনের স্বার্থ
(৫) চীনের স্বার্থ
(৬) বার্মা বা মায়ানমারের স্বার্থ

Dhaka University Institutional Repository

শেষ অধ্যায় ঃ ১২৯-১৩৫

উপসংহার

পরিশিষ্ট ১৩৬-২২৩

৭। পরিশিষ্ট-১ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংবিধি ১৯০০ সাল।

পরিশিষ্ট-২ ঃ ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি

পরিশিষ্ট-৩ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮

পরিশিষ্ট-৪ ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন-১৯৮৯

পরিশিষ্ট-৫ ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধন কল্পে প্রণীত আইন-১৯৯৩

পরিশিষ্ট-৬ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন,- ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধন কল্পে প্রণীত আইন-১৯৯৭

পরিশিষ্ট-৭ ঃ রাঙ্গমাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধন কল্পে প্রণীত আইন- ১৯৯৮

পরিশিষ্ট-৮ঃ জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামটি ঘোষণা পত্র ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮

পরিশিষ্ট-৯ ঃ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাঁচ দফা দাবি নামা-২০০০

৮। গ্রন্থপঞ্জী ২২৪-২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

THE CHITTAGONG HILLTRACTS

Sylhet
INDIA
Agartala
Dhaka
Comilla
Khagrachari
BANGLADESH
Khulna
Rangamati
Chittagong
Bandarban
Cox's Bazar
BAY OF BENGAL
BURMA

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহে বহিঃশক্তির ভূমিকা

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। বাংলাদেশের আয়তন ৫৬৯৭৭ বর্গমাইল।[১] বাংলাদেশের ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। যার আয়তন ৫১১৮ বর্গমাইল;[২] বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে এটা অবস্থিত। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-খণ্ডটি বর্তমানে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার সমন্বয়ে গঠিত। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থানের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটা সম্ভাবনাময় অঞ্চল।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের একটি দেশ। এ অঞ্চলের দেশসমূহের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং এব জনগণের জীবনযাপন প্রণালীতে প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাস, সভ্যতা তুর্কী-আফগান-মোগল শাসন এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়া একটি অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর কতকগুলো সাধারণ উদ্বেগ ও স্বার্থ রয়েছে। তারা শান্তি স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নতি চায়, কিন্তু দেশগুলোর মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টিভংগীর ভিন্নতা রয়েছে। এই স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও ভিন্নতা বাইরের শক্তিগুলোকে তাদের স্বার্থ আদায়ের সুযোগ করে দিয়েছে।[৩]

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশকে যেভাবে বিভক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল পরবর্তী সময়ের অস্থিতিশীলতা অশান্ত ও বৈরী বিষবৃক্ষের বীজ। ঐ বিভাজনের মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষের বহু উপাদান মিশ্রিত ছিল। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ঐসব দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এ-অঞ্চলকে তাদের নিজ স্বার্থে ব্যবহারে উদ্যোগী হয়।[৪]

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে এ কথাটি প্রযোজ্য। ভারত-পাকিস্তান যখন বিভক্ত হয় তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন দেশের সাথে যুক্ত হবে তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম কি ভারত, পাকিস্তান নাকি বার্মার সাথে যুক্ত হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্বের ফলে, পরবর্তীকালে বহিঃশক্তিসমূহ এই অঞ্চলের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

উপজাতিয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও তারা কোন দেশের সাথে যুক্ত হবে তা নিয়ে মত পার্থক্য ছিল। কামিনি মোহন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতভূক্তির জন্য বোম্বে, দিল্লী ও কলকাতায় কংগ্রেস নেতাদের নিকট ধর্ণা দিতে থাকেন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে মুসলিম লীগ চাকমাদের মুসলিম নাম ও উপাধি ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানায়।

১৯৪৭ সালের ৯ আগস্ট বেঙ্গল বাউন্ডারী এওয়ার্ড কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল রেডক্লিফ পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত রাখার প্রস্তাব করেন এবং ভাইস লর্ড মাউন্ট বেটেন তা অনুমোদন করেন। তৎকালীন অনেক উপজাতির নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানভুক্তিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ঘনশ্যাম দেওয়ান, স্নেহকুমার চাকমাসহ আরো কয়েকজনের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং সেটা ২০ আগস্ট পর্যন্ত উত্তোলিত ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি রেজিমেন্ট ২১ আগস্ট ঐ পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে।[৬]

অপরদিকে বোমাং সার্কেলের মার্মারা বার্মার সাথে যুক্ত হতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে এবং বার্মার সাথে একাত্মতা ঘোষণার প্রতীক হিসেবে তারা বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করে। এখানেও পাকিস্তানী সৈন্যরা বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তুলেছিল পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সরকার নেতৃস্থানীয় মার্মাদের বিদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করলে অনেকে বার্মায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। চাকমা উপজাতিয়দের অনেকেই ত্রিপুরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৪৭-এর দেশ বিভাজনের সময়ে এ-সব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি সমস্যা সংকুল অঞ্চলে পরিনত করে এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিতে বহিঃশক্তির প্রভাব বাড়তে থাকে।

পাকিস্তান আমলে উপজাতিয়দের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষোভের জন্ম দেয় কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প। ১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তান সরকার আমেরিকার এক বহুজাতিক কোম্পানির সহায়তায় কর্ণফুলি নদীর মোহনা থেকে ৩৫ মাইল উজানে কাপ্তাই নামক স্থানে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজে হাত দেয়। এই জলাধারের কারণে প্রায় এক লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের বেশির ভাগই চাকমা গোষ্ঠীভুক্ত।[৮]

পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অব্যবস্থাপনার জন্য প্রায় ৪০,০০০ চাকমা উপজাতি সদস্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে যায় এবং তারা আর কখনও ফেরত আসেনি। ভারত সরকার সে সময়ে কৌশলগত কারণে আশ্রয়প্রার্থী চাকমাদের কিছু অংশকে বর্তমান অরুণাচল প্রদেশে পুর্নবাসিত করে অবশিষ্টাংশকে মিজোরামে।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব ভারত-চীন উভয় দেশের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উভয় দেশই পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশকে তাদের স্ব স্ব প্রভাব বলয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে।[১০] ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পরই ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উদ্বাস্তুদের ভূকৌশলগত কারণে অরুণাচল ও মিজোরাম প্রদেশে পুর্নবাসিত করেছিল।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীন ও ভারত এই উভয় শক্তি পরস্পর বিরোধি অবস্থান নিয়েছিল। চীন পাকিস্তানের পক্ষে এবং ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন দিয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত চাকমা সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সাহায্য না করলেও সে সময় চীন তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।[১১] পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চীন উপজাতিয় বিদ্রোহীদের সাহায্য বন্ধ করে দিলে, ভারত কৌশলগত কারণে উপজাতিয়দের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

এভাবে দেখা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহে কোন না কোন বহিঃশক্তির সমর্থন ছিল।

ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরুত্ব দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপজাতিয়দের সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য আমেরিকা এই অঞ্চলের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ-

১) পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিয়দের আগমন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;

২) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ;

৩) বহিঃশক্তিসমূহ বিশেষ করে ভারত, চীন, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে আগ্রহী সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;

৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিয় বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিয় বিদ্রোহ কি বাঙালিদের শোষণ প্রক্রিয়ার ফসল? নাকি এই বিদ্রোহে বহিঃশক্তিসমূহের সমর্থন ছিল সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;

৬) বাংলাদেশের নিরাপত্তানীতি এই বিদ্রোহকে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ;

৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ভারতের ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;

৮) শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভারতের ভূমিকা ছিল কিনা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;

৯) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার স্বার্থ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;

১০) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের উৎসাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং

১১) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর মায়ানমারের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

গবেষণার পদ্ধতি ঃ

এই গবেষণা করতে গিয়ে Primary Source এবং Secondary Source এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

Primary Source এর জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকাতে দেয়া বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান এবং রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Secondary Source এর জন্য বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষকের নিবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার গুরুত্ব

বিভিন্ন কারণে এই গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে;

১) বিভিন্ন দেশের ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত স্বার্থ সম্পর্কে ধারণা লাভ;

২) পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ;

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি বিদ্রোহে বহিঃশক্তির ভূমিকার মূল্যায়ন এবং

৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও মানবাধিকার সংগঠনের মনোভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study)

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বিভিন্ন বহিঃশক্তির স্বার্থ থাকলেও ভারতের স্বার্থ এখানে সবচেয়ে বেশি। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যের সীমান্ত ভৌগোলিকভাবে যুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য। উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং দক্ষিণে মায়ানমারের আরেকটি রাজ্য। ভারতের এসব রাজ্যে দীর্ঘকালধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির উপর ভারতকে সব সময় নজর রাখতে হয়। এই অভিসন্দর্ভে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং অন্যান্য শক্তির ভূমিকা সম্পর্কেও স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্র

এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-কৌশলগত অবস্থান ও ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

ভূকৌশলগত অবস্থানের কারণে ভারতকে সব সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে হয়। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশ অবস্থিত। এসব প্রদেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র আন্দোলন চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে এসব বিদ্রোহ দমাতে অথবা আরো বেশি উত্তেজিত করে তুলতে পারে। ভূ-কৌশলগত কারণে পাকিস্তান সরকার ভারতের এসব বিদ্রোহীদের সাহায্য করতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক সে সময় উষ্ণ ছিল। চাকমা উপজাতিরা সেসময় বিদ্রোহ করলেও কৌশলগত কারণে সে সময়ে ভারত তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেনি।

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক শীতল হতে থাকে। বিশেষ করে ফারাক্কা বাঁধ এবং শান্তি বাহিনীকে সহায়তা দানের কারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা দেখা দেয়।

এ-ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সমস্যাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের পর থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে নিরাপত্তা নীতির ক্ষেত্রে সব সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যে একই ধরনের ছিল এই অভিসন্দর্ভে তা দেখানো হয়েছে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সরকারের নিরাপত্তানীতির পরিবর্তন দেখা যায়। নিরাপত্তানীতির এই পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর যেসব ঘাঁটি ছিল তা ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আন্ত-সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় দুই দেশের সরকারের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল তার ফলেই শান্তি চুক্তি সম্পাদন যে সহজতর হয়েছিল তা প্রমাণ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ- এই অভিসন্দর্ভ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বিভিন্ন বহিঃশক্তির স্বার্থ দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ দেখানো হয়েছে। শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভারতের যে ভূমিকা ছিল তাও দেখানো হয়েছে।

বহিঃশক্তির ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে দেশের বৃহৎ তেল গ্যাস ব্লক নং ২২ গঠন করা হয়েছে এবং তা আমেরিকার এক তেল কোম্পানীকে ইজারা দেয়া হয়েছে। স্পর্শকাতর এই এলাকাতে গ্যাস অনুসন্ধান ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্থানীয় চাকরি নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। জাতীয় পর্যায়েও এর প্রতিক্রিয়া কীভাবে দেখা দিতে পারে তা দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

১। Bangladesh Bureau of Statistics- 1994, p-3.

২। মোঃ নুরুল আমিন-পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪২, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২-পৃ-১৩৫।

৩। Lt. Colnel. Md. Aminul Karim, Power Politics in the Indian Ocean Region after The cold war, BIISS Journal, Val-16, No.-4. 1995. P-509.

৪। সেলিম জাহান, কবীর চৌধুরী, দক্ষিন এশিয়ার শান্তি সম্প্রতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪২, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃঃ-৭

৫। সিদ্ধার্থ চাকমা-১৩৯২ বাংলা সন, প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম, কলিকাতা, নাথ প্রকাশনী, পৃ-১৩।

৬। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ ইবরাহীম পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ-৭৫।

৭। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম
পূর্বোক্ত, পৃ-৭৬।

৮। মোঃ নুরুল আমিন পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৯।

৯। দেববানী দত্ত/অনসূয়া রায় চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম, ১৯৯৬ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ,ভারত পৃ-৬৪।

১০। Abu Taher Salahuddin, Sino-Indian Relations Problems, Progress and prospects, BIISS Journal, Val.15. No.-4, 1994. P-357.

১১। ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামানের সাক্ষাৎকার আজকের কাগজ ২৯শে জুলাই, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

উপজাতির সমস্যা এবং এই সমস্যা উদ্ভবের কারণসমূহ বিশ্লেষণ

ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক দিক থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় একটি এলাকা। স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে দেখা দেয় উপজাতিয় বিদ্রোহ। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি শাসনতন্ত্র উপহার দিতে সমর্থ হলেও উপজাতিয় বিদ্রোহের সূচনা কিন্তু আওয়ামী লীগ আমলেই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উপজাতি বিদ্রোহ শুরু হলেও বিদ্রোহের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে যার ব্যাপ্তি বৃটিশ এবং বৃটিশ-পূর্ব আমল পর্যন্ত প্রসারিত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বৃটিশ-পূর্ব আমল

বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সব সময় বাংলাদেশেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম (তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম আলাদাভাবে কোন জেলা ছিল না) হরিকেল জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম সাময়িকভাবে আরাকান কিংবা ত্রিপুরাদের দখলে চলে গেলেও পুনরায় তা বাংলার শাসকদের অধীনে চলে আসত।[১] ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন বসতি গড়ে ওঠেনি। সমগ্র মুসলিম আমল এবং ইংরেজ শাসনের একশত বছর পরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে কোন আলাদা জেলার অস্তিত্ব ছিল না।

বৃটিশ আমল

বৃটিশ আমলে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। বৃটিশ আমলে ভারতের অনেক আইন পার্বত্য চট্টগামের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। ১৯০০ সালে বৃটিশরা একটি আইন পাশ করে যার নাম "পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন-১৯০০" (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীতে এই আইন 'বহির্ভূত এলাকা আইন ১৯০০' নামে পরিচিত হয়। এই আইন বলে এই অঞ্চলের প্রকৃত ক্ষমতা একজন সুপারিনটেনডেন্ট বা জেলা প্রশাসকের হাতে চলে যায়।[২] এই আইনে তৎকালীন ভারতের অন্যান্য এলাকার প্রশাসনিক ও সম্পত্তি আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। এই আইনে

Dhaka University Institutional Repository

এখানে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি স্থাপনও নিষিদ্ধ ছিল। এ অঞ্চল ছিল "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" আইনের বাইরে। বৃটিশ সরকার এ আইন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে যা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও বহাল রাখা হয়।[৩]

পাকিস্তান আমল

পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি গৃহীত শাসনতন্ত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয়।[৪] ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের 'পৃথক শাসিত অঞ্চল' শব্দের পরিবর্তে 'উপজাতিয় অঞ্চল' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতিয় অঞ্চলের মর্যাদা স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সমস্যার সূত্রপাত

উপজাতি সমস্যার সূত্রপাত সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে অধ্যাপক নুরুল আমিন তাঁর প্রবন্ধ 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ'-এ উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতি গঠনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে নয় মাসের মধ্যে জাতিকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান করে ভারতীয় মডেলের সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বাংলাদেশের ঊষালগ্ন থেকে শুরু হলেও এর সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। আর যার মূল কারণ নিহিত ছিল উপজাতিয় আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বাঙালিদের শোষণের মধ্যে। ষাট দশকে পাকিস্তান আমলে নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনে নিয়ে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, বেকারত্ব আর অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা। কাপ্তাই বাঁধ উপজাতিয়দের প্রচলিত জুম চাষের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। এই বাঁধ ৪০০ বর্গমাইল এলাকা অর্থাৎ পুরো পার্বত্য এলাকার শতকরা ৪০ ভাগ চাষযোগ্য জমি জলমগ্ন করে তোলে। ফলে ১৮০০ পরিবারের প্রায় এক লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৫] সরকার ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীর ক্ষতিপূরণের নামে যে অর্থ বরাদ্দ করে তার সিংহভাগ ভোগ করে সমতল ভূমি থেকে আগত বাঙালিরা। যার ফলে ১৯৮৪ সালের শেষের দিকেও, উপজাতি জনগোষ্ঠির কণ্ঠে শোনা যায় এ ধরনের খেদোক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

I have not been able to construct a house like built by my ancestors and which is now under the water of the Kaptai Lake. I now live in a makeshift thatched house.[৬]

সব চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হচ্ছে কাপ্তাই বাঁধের উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ আলোকিত করেছে সরকারি অফিস, থানা, মিলিটারী ক্যাম্প, আর ঐ অঞ্চলের বৃহত্তর উপজাতি জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ি আলোকিত করেছে কেরোসিনের নিভু নিভু প্রদীপ। ফলে এই বাঁধ উপজাতিয়দের জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি, শুধু বাড়িয়ে দিয়েছে দুর্দশা। তাই জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অধিকাংশ উপজাতির লোকের প্রতীতি জন্মেছে কাপ্তাই বাঁধ তাদের জীবনে অভিশাপ ডেকে এনেছে। ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান যখন এই এলাকা পরিদর্শনে যান তখন উপজাতি জনগোষ্ঠী স্মারকলিপির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে এই অভিযোগ তুলে ধরেন। স্মারক লিপির ভাষায় ঃ-

The vast expenses of water captured by the dam provides a scene which impresses every visitor with its beauty. But could any body have thought that this immense body of water is to some extent filled with the tears of the local people? Through the cables of the electric line not only current flows but also the sighs of grief.[৭]

পাকিস্তান আমলে বাঙালিরা যেমন পাঞ্জাবিদের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হতো, ঠিক একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিয়রা বাঙালিদের দ্বারা শোষিত হতো। বাঙালি মহাজন ও ব্যবসায়ীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে উপজাতিয়দের কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্যে উৎপাদিত তাদের দ্রব্যাদি ক্রয় করে পরে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছে। চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য বজায় রেখেও শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে। পার্বত্য এলাকায় সরকারি উদ্যোগে কলকারখানা স্থাপিত হলেও বাঙালিদের তুলনায় উপজাতিয়রা চাকরি কম পেত।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর যুগ যুগ ধরে পুঞ্জিভূত বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। যার ফলে পাহাড়িদের মনে বাংলাদেশ বিদ্বেষী মনোভাব গড়ে ওঠে। আর মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা বাংলাদেশ বিদ্বেষী মনোভাবকে পুঁজি করে জুম্ম জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত হিসেবে পরিণত হন।

Dhaka University Institutional Repository

মানবেন্দ্র লার্মা ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে উপজাতিয়দের চারদফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলো হচ্ছে-

১) পার্বত্র চট্টগ্রামের নিজস্ব আইন সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন;
২) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ বিধি বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজন করা;
৩) উপজাতিয় রাজাদের দফতরগুলোর সংরক্ষণ করা এবং
৪) সংবিধানে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের চার দফা, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের 'এক সংস্কৃতি' ও 'এক ভাষানীতি' উপজাতিয়দের বিদ্রোহী করে তোলে। যার ফলে জন্ম নেয় জুম্ম জাতীয়তাবাদের। এই জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা। তিনি পাহাড়িদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১৬ মে গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে দুটি আসনেই জনসংহতি সমিতির প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের নির্বাচন উপজাতিয়দের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি শান্তিবাহিনী গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালে শান্তি বাহিনী গঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর এই সংগঠনের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জিয়াউর রহমানের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য এলাকায় বাঙালি বহিরাগতদের পুনর্বাসন দ্রুতিগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরশাদ সরকারের আমলে পার্বত্য এলাকায় বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পাহাড়ি ও বহিরাগত বাঙালি লোকসংখ্যার অনুপাত ৫০ঃ৫০ এসে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য জিয়াউর রহমান সরকার ও এরশাদ সরকারের আমলে শান্তি বাহিনীর আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ে ভারতের সাহায্যে শান্তি বাহিনী নতুন শক্তি সঞ্চয় করে। কৌশলগত কারণেই ভারত শান্তি বাহিনীকে সহায়তা করে। পাকিস্তান আমলে ভারতের নাগা ও মিজো বিদ্রোহীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যাঞ্চলে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিত। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হওয়ার ফলে ভারত বাংলাদেশকে আভ্যন্তরীণভাবে হুমকির সম্মুখীন রাখার জন্য এই কৌশল গ্রহণ করে। একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম। তিনি তাঁর লেখাতে ভারত কর্তৃক শান্তি বাহিনীকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন- ১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ভারত সরকার বাংলাদেশ রুশ ব্লক হতে সরে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ছে এ ধারণা পোষণ করতো এবং তখন থেকেই ভারত বাংলাদেশকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে শান্তি বাহিনীকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ২) মিজোরামের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ (এম.এন.এফ) এর ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ (সি.এন.ডি) কে যাতে বাংলাদেশ সহায়তা দিতে না পারে তথা এ দুই গ্রুপকে কাউন্টার দেওয়ার জন্য শান্তি বাহিনীকে ব্যবহার করা ।[৮] শান্তি বাহিনীকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য জিয়াউর রহমান এই এলাকায় প্রায় এক লক্ষ্য সৈন্য মোতায়েন করেন, যা এরশাদ সরকার পরবর্তীকালে হুবহু অনুসরণ করে। জিয়া-এরশাদ আমলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেমন উপজাতিয়দের অমানুষিক নির্যাতন করে ঠিক একইভাবে এ সময়ে শান্তিবাহিনী বর্বরোচিতভাবে বহিরাগত বাঙালিদের হত্যা ও লুণ্ঠনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এসময়ে উপজাতিয়রা তাদের চার দফা দাবির বেষ্টনিতে আবদ্ধ না থেকে আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকারের দাবি তোলে। এ দাবি তুলতে গিয়ে পাহাড়িরা জুম্ম জাতীয়তাবাদের পক্ষে বক্তব্য উত্থাপন করে।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১। জয়নাল আবেদীন, পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বরূপ-সন্ধান, আমেনা বেগম, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ-২৭।

২। S. Mahmud Ali, The Fearful State, Power, People and Internal War in South Asia : ZED Books: London, New Jersy. 1993. P-174

৩। S. Mahmud Ali, Ibid-175

৪। S. Mahmud Ali, Ibid-176

৫। মোঃ নুরুল আমিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪২, ফেব্রুয়ারি-১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৩৯।

৬। মোঃ নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৯

৭। মোঃ নুরুল আমিন, পূর্বোক্ত- পৃ-১৩৯

৮। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ-১০২

৯। মোঃ নুরুল আমিন পূর্বোক্ত- পৃ-১৪১

Dhaka University Institutional Repository

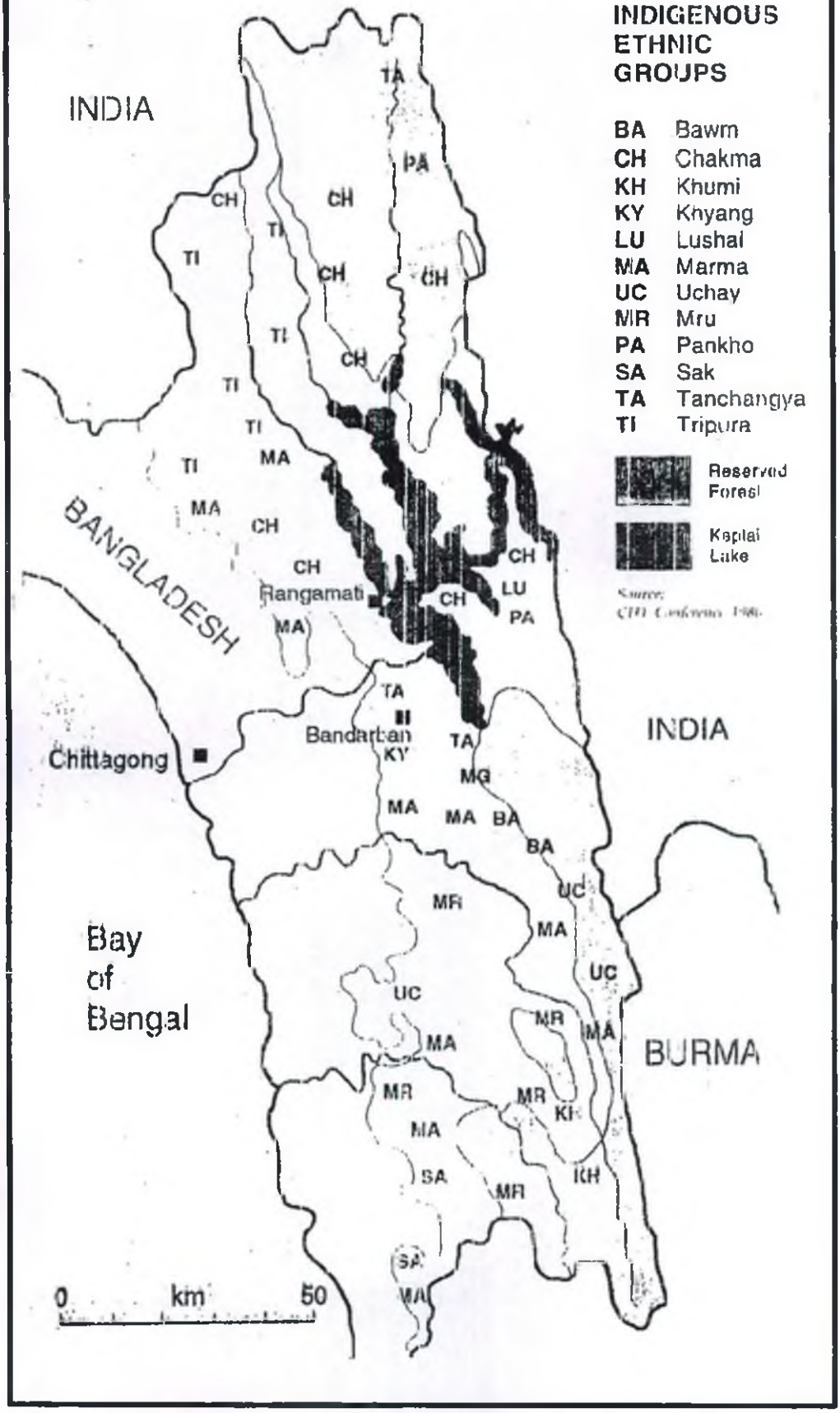

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ পরিচিতি ও জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের প্রায় ২১.২৫´ থেকে ২৩.৪০´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১°৫৫´ থেকে ৯২°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। যা Chittagong Hill Tracts নামে পরিচিত।[১] যার প্রশাসনিক তিনটি জেলা রয়েছে। এগুলো হলো রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫১১৮ বর্গমাইল।[২]

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও মায়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের সাথে ভৌগোলিকভাবেযুক্ত। অঞ্চলটির পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য, দক্ষিণ মায়ানমারের (বার্মার) আরাকান রাজ্য, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত।[৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা

দশ ভাষাভাষি তেরটি উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তেরটি উপজাতিকে হান্টার 'পাহাড়ি উপজাতি' উপত্যাকাবাসী উপজাতি এবং সোফার এদেরকে টিলাবাসী পাহাড়িয়া ও তীরবাসী পাহাড়িয়া এই দুইভাবে বিভক্ত করেছেন।[৪] পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিয়রা হলো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চাংগা, বোম, কানখুয়া, খুমি ম্র, খিয়াং চাক, লুসাই ও রিয়াং। সারণী ১ এর মাধ্যমে বহিরাগত বাঙালিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকসংখ্যার হিসেব দেখানো হলো-

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যার সারণী

সারণী–১
উপজাতীয় লোক সংখ্যা

উপজাতি	জেলা খাগড়াছড়ি	জেলা রাংগামাটি	জেলা বান্দরবন	মোট
চাকমা	৯৬৫৯৫	১৪১৫৯৫	৩৪২৬	২৪১৬১৬
	(৩২.১৭٪)	(৪২.৮৩٪)	(২.০৯٪)	(৩০.৫৭٪)
মারমা	৪৬,১৬৮	৩৩,৬৬৮	৫১,৩৯৮	১,৩১,২৩০
	(১৫.৩৭٪)	(১০.২৪٪)	(৩১.৬৬٪)	(১৬.৬০٪)
ত্রিপুরা	৪৬৪৪২	৫,৩৪২	৬,৬৭১	৫৮,৪৫৫
	(১৫.৪৬٪)	(১.৬১٪)	(৪.০৯٪)	(৭.৩৯٪)
মুং	–	১৭৬	১৬,৯৯২	১৭১৬৮
		(০.০৫٪)	(১০.৪২٪)	(২.১৭٪)
তঞ্চংগা	–	১০,৬৬১	৫৪৭৯	১৬,১৪০
		(৩.২৩٪)	(৩.৩৬٪)	(২.০৪٪)
বোম	–	১১৬	৫,৪৬৮	৫,৫৮৪
		(০.০৩٪)	(৩.৩৬٪)	(০.৭১٪)
পনখুয়া	–	১৬৬৮	–	১৬৬৮
		(০.৫১٪)		(০.২১٪)
খুমি	–	–	১,০৯১	১,০৯১
			(০.৬৩٪)	(০.১৪٪)
ম্রু	–	–	৯৬৬	৯৬৬
			(০.৫৮٪)	(০.১২٪)
খিয়াং	–	৮২৭	৫০১	১,৩২৮
		(০.২৪٪)	(০.২৯٪)	(০.১৭٪)
চাক	–	–	৭৯৮	৭৯৮
			(০.৪৯٪)	(০.১০٪)
লুসাই	–	৬৫৩	১৬	৭৯৮
		(০.১৯٪)	(০.০৯٪)	(০.০৮٪)
রিয়াং	২,০৩৪	৪০০	–	২,৪৩৪
	(০.৬৬٪)	(০.১২٪)		(০.৩১٪)
উপজাতি	১,৯১,২৩৯	১,৯৫,১০৬	৯২,৮০২	৪,৭৯,১৪৭
	(৬৩.৬৯٪)	(৫৯.৪৮٪)	(৫৭.১৮٪)	(৬০.৬২٪)
বাঙালী	১,০৮,৯৭৯	১,৩২,৮১৮	৬৯,৪৭০	৩,১১,২৬৭
	(৩৬.৩০٪)	(৪০.৪৯٪)	(৪২.৭৬٪)	(৩৯.৩৮٪)
সর্বমোট	৩,০০,২১৮	৩,২৭,৯২৮	১,৬২,২৭২	৭,৯০,৪১৪
	(১০০.০০٪)	(১০০.০০٪)	(১০০.০০٪)	(১০০.০০٪)

Source: Population Chart, A Document Published by the Chittagong Hill Tracts Development Board, 1989.

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতিয়দের আগমন ও পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে কখন যে জনবসতি গড়ে ওঠে তা নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। তবে প্রাচীনকালে বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল বিধায় এবং জনসংখ্যা অনেক কম থাকার কারণে পাহাড়ি অঞ্চলে তেমন বাঙালি জনবসতি গড়ে ওঠেনি। প্রাচীনকালে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামে হরিকেল জনপদের অংশ হিসেবে বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল [৫]। পর্যায়ক্রমে এখানে জনস্থানান্তরিত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামেও জনস্থানান্তর ঘটতে থাকে।

চাকমাসহ সব উপজাতি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রিত একথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে অনেকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

চাকমা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ১২টি উপজাতি বসবাস করে। হান্টার তেরটি উপজাতিকে "পাহাড়ি উপজাতি উপত্যকাবাসী উপজাতি " হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সোফার এদেরকে 'টিলাবাসী পাহাড়ি এবং তীরবাসী পাহাড়িয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে এই অঞ্চলের সব জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর চীনা ভোট সম্প্রদায় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সব উপজাতিয়দের উৎপত্তি, নিম্নের ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো-

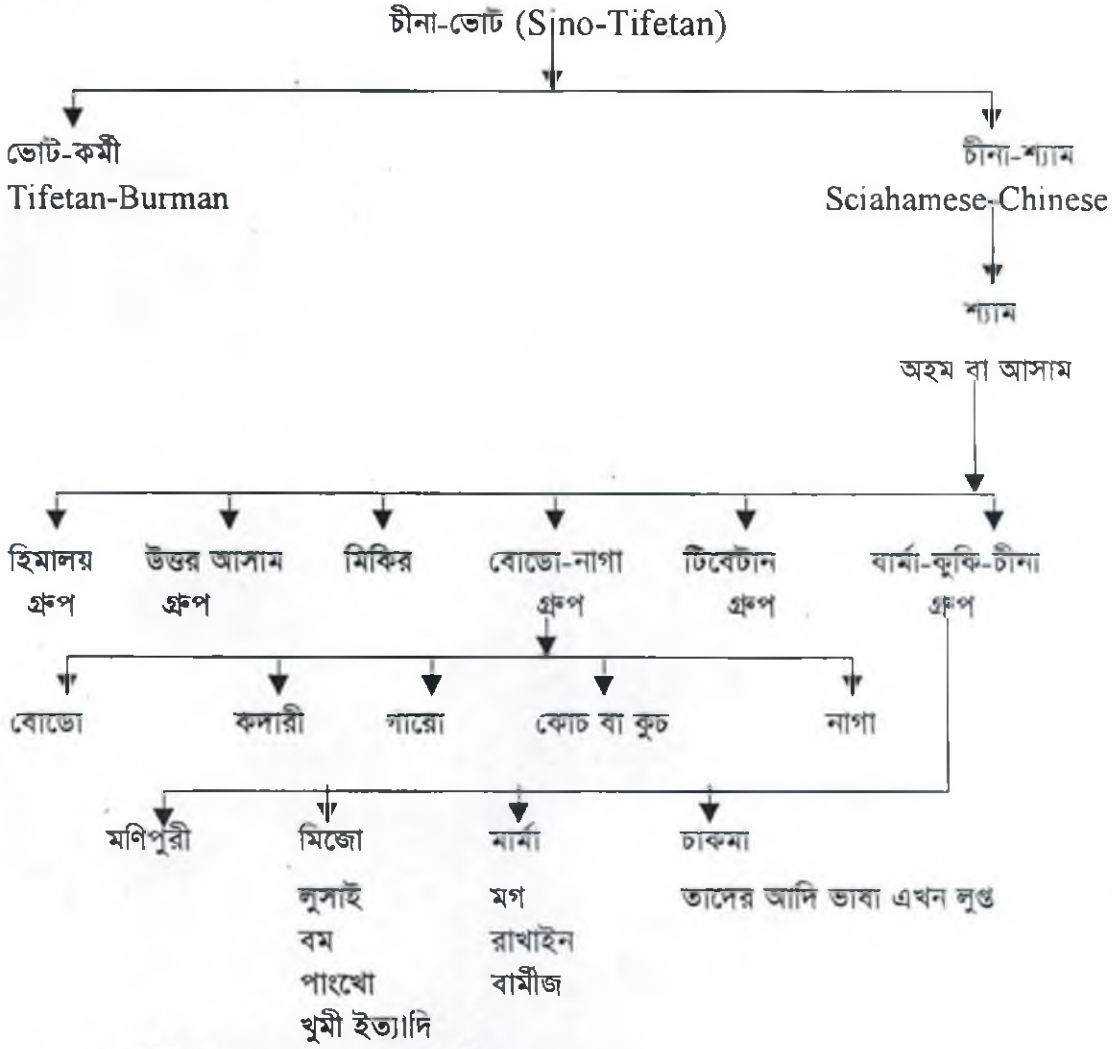

উৎস: বরেন ত্রিপুরা, ত্রিপুরা জাতি, সাপ্তাহিক পার্বতী, নভেম্বর ২৩, ১৯৯০ ইং

Dhaka University Institutional Repository

নৃতত্ত্ববিদদের মতে উপজাতিয়রা আকৃতি ও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। আসাম এবং আপেয় বার্মার সাথে তাদের অর্থনীতি, কৃষ্টি, সামাজিক বৈশিষ্ট্য তুলনা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী তেরটি উপজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলো-

১। চাকমাঃ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১৩টি উপজাতির মধ্যে চাকমারা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। শিক্ষা-দীক্ষায় এবং আর্থিক সমৃদ্ধিতে চাকমারা অন্যান্য উপজাতি থেকে অগ্রগামী। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, আসাম অরুণাচল এবং বার্মার আকিয়াব অঞ্চলেও এই জনগোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায় রয়েছে। চাকমারা কোথা থেকে এসেছে এবং তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মতবাদ রয়েছে।

চাকমাদের আদিবাসস্থান বা শেকড় সন্ধান করতে গিয়ে চাকমা ঐতিহাসিকগণ চম্পাপুরী বা চম্পক নগর রাজ্যের কথা উল্লেখ করেন। এই চম্পক নগরের অধিবাসীরাই চাকমা নামে অভিহিত বলে অনেকে মনে করেন।[৬]

বিরাজ মোহন দেওয়ান "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে ভারত এবং ভারতের বাইরে কমপক্ষে ৫টি স্থানের নাম চম্পক নগর বা চম্পাপুরী আছে বলে দাবি করেছেন। চম্পাপুরীর বা চম্পক নগরের সন্ধান করতে গিয়ে বিরাজ মোহন দেওয়ান উত্তর ব্রহ্ম (শান) প্রাচীন মগধ (বর্তমানে বিহার) কালাবাঘা (বর্তমানে আসাম) প্রাচীন মল্লিকা (বর্তমানে মালয়) কৌচিনে এবং হিমালয়ের পাদদেশস্থ সাংগুন নদীর তীরে (বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র) প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে চম্পক নগরের অস্তিত্ব খুঁজে বেরিয়েছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি যে আসল চম্পক নগর কোথায় এবং কোন চম্পক নগর থেকে চাকমারা এসেছে। বিরাজ মোহন দেওয়ান তাঁর গ্রন্থে "জাতীয় পরিচয়" পরিচ্ছেদে ৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণামূলক তথ্য উপস্থাপন করে উপসংহারে মন্তব্য করেছেন "চাকমাদের পূর্ব পুরুষ যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ পুত্র নহে তাহা স্পষ্ট"।

চাকমা জাতি যে এককালে ব্রহ্মদেশে ছিল সে সম্পর্কে কর্নেল ফেইরি আলোকপাত করেছেন। ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত "হুইজং ক্য অং" এবং আরাকান কাহিনী দেঙ্গ্যাওযাদি আরোদফুং নামক গ্রন্থদ্বয়েও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

চাকমাদের জাতিগত উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতভেদ প্রচলিত। স্যার বিজলীর মতে ব্রহ্মদেশের সাক বা সেক জাতি থেকে চাকমাদের উৎপত্তি। ক্যাপ্টেন লাইনের অভিমত The name chakma is given to this tribe in general by the inhabitants of the chittagong Districts and the largest and dominant action of the Tribe

Dhaka University Institutional Repository

recognises this as its rightful appellation. It is also sometimes spelt Tsakma or Task as it is called in Bermese Thek.[৭]

এ মন্তব্যে চাকমা কথাটি যে মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের নয় সম্ভবত এ কথাটি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

মগ বা মারমাদের মতে চাকমারা মোগলদের উত্তর-পুরুষ। কোন এক সময় মোগলরা আরাকান রাজ্যের কাছে পরাজয় বরণ করে। ফলে বহু মোগল সৈন্য বন্দিদশায় আরাকানে থাকতে বাধ্য হয়। আরাকানি মেয়েদের সাথে মোগল যোদ্ধাদের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব মোগল সৈন্য ও আরাকানি নারীর বৈবাহিক সূত্রে ক্রমশ যে জাতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তারাই সেক বা সাক।[৮]

জে পি মিলস এর অভিমত সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকেই মোগলদের ধর্ম গ্রহণ করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।[৯]

ক্যাপ্টেন হার্বাস লুইসের মন্তব্য ভাষ্য থেকেও এর সমর্থন মেলে। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মোগলদের বংশধর না হলেও এককালে এরা মুসলমান ছিল।[১০]

চাকমাদের আদি উৎসের সন্ধানে ডকটর হাটন- এর যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি অলোমশ বিরল শ্মশ্রু চ্যাপটা নাক ও ভুরু ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে চাকমাদের মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত জাতি সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

২। মুরং (ম্রো)ঃ মুরংরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলাতেই বেশি বসবাস করে। এদের আদিনিবাস আরাকানে। উত্তর বার্মা থেকে মুরংরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এসেছিল।[১২] অনেকের মতে মুরংরা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। ক্যাপ্টেন লুইসের ভাষ্য মতে তারা আরাকানের খুমী উপজাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। আরাকান রাজ্যের ইতিবৃত্ত Rajaweng গ্রন্থ থেকে জানা যায় মুরংদের পূর্বপুরুষদের একজন সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজা ছিলেন। স্যার রিজলে এবং হাটন প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এদের রক্তধারায় মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ নেই বরং নিগ্রোবটু মানবগোষ্ঠীর লক্ষণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।[১৩]

৩। মারমাঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলাতেই মারমা বা মগরা বসবাস করে। তবে কক্সবাজার এবং পটুয়াখালীর খেপুপাড়া অঞ্চলেও এদের অধিক সংখ্যক দেখা যায়। মারমারা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মগ নামে অধিক পরিচিত। মারমাদের মতে মগ নামে কোন জাতি বা উপজাতি নেই। তাই তারা মারমা নামে পরিচিত হতে পছন্দ করে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর

Dhaka University Institutional Repository

সময় তাদেরকে মগ হিসাবে গণনা করতে গেলে তারা আপত্তি তোলে এবং মগের পরিবর্তে মারমা নামে অভিহিত করার আবেদন জানায়।[১৪]

মারমা শব্দটি ম্রাইমা শব্দ থেকে উদ্ভূত। মারমা ম্রাইমা, মায়ানমার প্রভৃতি শব্দ সমগোত্রীয় এবং এ থেকে বুঝা যায় যে মারমারা বার্মা তথা মায়ানমারের অধিবাসী।[১৫] মুঘল আমলে তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুঘলরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। মুঘলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে মারমা রাজা ১৭৫৬ সালে আরাকানে আশ্রয় নেন। পরবর্তী সময়ে ১৭৭৪ সালের দিকে মারমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস আরম্ভ করে।[১৬]

৪। **ত্রিপুরা বা টিপিরা :** টিপরা বা ত্রিপুরা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করলেও খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে তাদের উপস্থিতি সবচাইতে বেশি। টিপরা কথাটি ত্রিপুরা থেকে উদ্ভূত। ত্রিপুরা ভাষায় টুই অর্থ পানি এবং প্রা অর্থ আধিপত্য। পার্বত্য ত্রিপুরার চারিদিক আগে পানি দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং সেখানে যারা আধিপত্য করতো তাদেরকে বলা হতো টুইপা। এই টুইপা থেকে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। এ থেকেই বুঝা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের টিপরাদের আদি নিবাস ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে।[১৭]

টিপরাদের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। টিপরারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী তবে তাদের মধ্যে প্রাচীন রীতি-নীতি ও সংস্কার দেখা যায়। হান্টার এবং হাচিনসন এর মতে টিপরাদের উৎপত্তি কুকি থেকে, তবে টিপরারা তা মানতে রাজি নন। এদের আকার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে রিজলে টিপরাদের আদি মঙ্গোলীয় ধারার বলে মন্তব্য করেছেন। টিপরাদেরকে ইন্দো-মঙ্গোলীয় ধারার হিসাবে গণ্য করা হয়।[১৮]

৫। **লুসাইঃ** লুসাইরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্রই বসবাস করলেও সাজেক অঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় এদেরকে বেশি মাত্রায় দেখা যায়। তুলেসপুই, তুইজুই, রূপলুই ইত্যাদি মৌজায় এদের বসবাস। লুসাই পাহাড়ে বর্তমানে মিজোরামে বসবাসকারী উপজাতিয়রাই লুসাই নামে পরিচিত।[১৯] তাদের মূল বসবাস ভারতের মিজোরাম অঞ্চলে।

লুসাই নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত আছে। ক্যাপ্টেন হার্বাস এর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায় লু অর্থ মাথা এবং সাই অর্থ কর্তন করা। অর্থাৎ যারা মাথা কাটে তাদেরকে লুসাই বলা হয়। এককালে এরা যে অত্যন্ত হিংস্র ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আবার তাদের শান্ত স্বভাবের চরিত্রেরও অনেক সমর্থন পাওয়া যায়।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

লুসাইরা আদি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জাতি। লুসাইরা প্রাচীন ধর্ম-কর্ম এবং প্রেতপূজায় Amimism বিশ্বাসী।[২১] তবে বর্তমানে তাদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বাড়ছে। তারা প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল।[২২]

৬। **খুমিঃ** খুমিরা প্রধানত বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শংখ ও মাতামুহুরী নদীর তীরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে এরা বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় মধু, থানছি রুমা ও লামা এলাকার গহীন অরণ্যে এরা বসবাস করে। Captain T.H Lewin এর প্রদত্ত তথ্য উদ্ধৃত করে সুগত চাকমা জানিয়েছেন যে আরাকানে খুমি ও ম্রোদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল। ঐ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে খুমিরা জয়ী হয়ে ম্রোদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করে দেয় এবং পরে সম্ভবত তারাও অন্যান্যদের চাপে পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে।[২৩]

৭। **তংচঙ্গাঃ** তংচঙ্গোরা মূলত চাকমাদেরই একটি জাতি।[২৪] কিন্তু তংচঙ্গোরা এখন আর তা স্বীকার করে না। তারা মনে করে তারা একটি পৃথক সত্তার অধিকারী। মারমা এবং মগ সম্প্রদায় তাদেরকে দৈংনাক বলে অভিহিত করে। এর কারণ হলো, এককালে তারা আরাকানের দৈংনাক নামক স্থানে বসবাস করতো।[২৫] সেই আদি নিবাসের নামানুসারে তাদের দৈংনাক বলা হয়। আবার আরাকানের আদি নাম রোয়াং। আর সে কারণে বান্দরবানে বসবাসকারী তংচঙ্গোদের রোয়াঙ্গাও বলা হয়ে থাকে।

আরাকানী গ্রন্থ দেঙ্গাওয়াদি আরেদফুং থেকে জানা যায় যে তংচঙ্গাদের আদি নিবাস আরাকানে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের আগমন ঘটে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।[২৬]

৮। **বোমঃ** বোমরা প্রধানত বান্দরবান জেলার রুমা অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের আগমনের ইতিহাস অষ্টাদশ শতকের দিকে। সুগত চাকমার মতে ১৮৩৮-১৮৩৯ সালের দিকে লিয়ানকু নামক সর্দারের নেতৃত্বে বোমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং বান্দরবানে বসবাস করতে থাকে।[২৭]

৯। **খিয়াংঃ** খিয়াংরা আরাকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল।[২৮] তারা আরাকানের উমাতানং পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করতো। তবে তারা ঐ অঞ্চলে কবে এসেছে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। প্রদীপ চৌধুরী লিখিত 'খিয়াং উপজাতি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, কোন এক সময় খিয়াংদের কোন এক রাজা একযুদ্ধের সময় বার্মা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসেন এবং স্বদেশে ফেরার পথে তার ছোট রাণীকে অন্তঃস্বত্তা অবস্থায় ফেলে যান। খিয়াংদের ধারণা তারা এখানে ফেলে যাওয়া ছোট রাণীর সাথে থেকে যাওয়া লোকদেরই বংশধর।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

১০। পাংখোঃ পাংখোয়া ভারতের লুসাই বা মিজোরাম হতে বাংলাদেশে এসেছে।[৩০] তাদের ধারণা তারা কোন এক পাংখোয়া গ্রামে বসবাস করতো।[৩১] পাংখোদের বাঁশ নৃত্য এবং ফুল নৃত্য দেশে বিদেশে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছে। পাংখোদের মধ্যে বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের সংখ্যা অনেক বাড়ছে।

১১। চাকঃ তাদের আদি নিবাস মায়ানমারের সীমান্তবর্তী চীনের য়ুনান প্রদেশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলাতে তারা বসবাস করে থাকে। বাইশারী, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলেখ্যং, কোয়াংঝিরি, রুইখালী অঞ্চলে তারা বসবাস করে।[৩২] সুগত চাকমার মতে সম্ভবত অতীতে কোন এক সময় আরাকান থেকে চাকদের একটি দল বাঘখালী নদীকে অনুসরণ করে ও অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিল।[৩৩]

১২। কুকিঃ প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ টি.সি হডসন এর মতে কুকিরা আসামের নাগা ও মণিপুরীদের অন্তর্গত জাতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্রই কুকিরা বসবাস করে। তবে বান্দরবানের মংগু থানচি এবং রুমা এলাকাতে তাদের সংখ্যা বেশি। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে আসাম এবং লুসাই এলাকা থেকে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল।[৩৪]

কুকিরা বিশ্বাস করে যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছিল পাথন। সমস্ত কিছুই তার নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছিল। সে আকাশে অবস্থান করে থাকে। কুকিরা অনেক দেব-দেবিতে বিশ্বাস করে থাকে।[৩৫] তাদেরকে সর্ব প্রাণবাদ বলা হয়। কুকিরা পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীর সমর্থক। বিধবা বিয়ে এবং তালাক প্রথা তাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কুকিদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, তবে তাদের কোন বর্ণমালা নেই।[৩৬]

১৩। রিয়াংঃ রিয়াংরা খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি জেলাতে বেশি বসবাস করে থাকে। রিয়াংদের সামাজিক কাঠামো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রিয়াংদের সামাজিক কাঠামোর অনুরূপ। রিয়াংরা তাদের গোত্র প্রধানকে রয় এবং কাচাক বলে।[৩৭]

১৯৮৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী রিয়াংদের মোট সংখ্যা ২৪৩৪জন।[৩৮] তারা অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ করে থাকে। রিয়াংরা তাদের মৃতদেহকে দামী পোশাক ও ফুলে সজ্জিত করে আগুনে দাহ করে।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। Bangladesh Bureau of Statistics. 1994, P-3.

২। মোঃ নুরুল আমিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা-৪২, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ-১৩৫। পৃঃ ১৩৫।

৩। Md. Nurul Amin, Secessionist movement in the Chittagong Hill Tracts. *Regional Studies*, Islamabad, 1988/89 Vol-3, No-1, P-140.

৪। এম, কামরুজ্জামান- পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট জাতীয়তা ও সংহতি, প্রান্তিক জার্নাল সংখ্যা-১২, জুন-১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২৩।

৫। আব্দুস সাত্তার- উপজাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, বাংলা একাডেমী-১৯৭৯, পৃ-১-২।

৬। বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত নিউ রাঙ্গামাটি ১৯৬৯, পৃ-৯৪।

৭। R.H.S, Hutcison. An account of Chittagong Hill Tracts. Calcutta 1906. P-43.

৮। সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি রাঙ্গামাটি ১৯৯৩, পৃ-৪০-৮০

৯। আব্দুস সাত্তার চাকমাঃ আদিবাসী নয় বহিরাগত, আহা পর্বত আহা চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক,অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ-১২।

১০। আব্দুস সাত্তার- উপজাতির সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট, বাংলা একাডেমী ১৯৭৯, পৃ-৪.

১১। আব্দুস সাত্তার, পূর্বোক্ত পৃ-৪।

১২। সুগত চাকমা- পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৩, পৃ-৪০।

১৩। নুহ-উল-আলম লেলিন- পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মুখে শান্তি পারাবার, হাক্কানি পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃ-২৯।

১৪। জয়নাল আবেদীন- পার্বত্য চট্টগ্রাম সরূপ সন্ধান, আমেনা বেগম, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ-৪৮।

১৫। মিঃ ক্যাশিপ্রত- মারমা উপজাতি পরিচিতি, অঙ্কুর ঃ ১ম সংখ্যা, রাঙ্গামাটি, ১৯৮১।

১৬। জয়নাল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮।

১৭। Md. Aminur Rahman, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Social Science Review. Vol-13, No-2, 1996, P-161.

১৮। Md. Aminur Rahman. Ibid, P-161.

১৯। সুগত চাকমা- পূর্বোক্ত, পৃ-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

২০। Md. Aminur Rahman, Ibid P-161.

২১। Md. Aminur Rahman. Ibid, P-161.

২২। Mizanur Rahman Shelly, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. The untold Story, Center for Development Research, Dhaka-1992, P-59.

২৩। সুগত চাকমা, পূর্বোক্ত- পৃ-৮১।

২৪। M.R. Shelly. Ibid, P-64.

২৫। আব্দুস সাত্তার চাকমা ঃ আদিবাসী নয় বহিরাগত, আহা পার্বত্য ঃ আহা চট্টগ্রাম, বিষয়ক স্মারক, ঢাকা-১৯৯৭, পৃঃ ৯।

২৬। পূর্বোক্ত।

২৭। জয়নাল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫১।

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ-৫১।

২৯। M.R.Shelly, Ibid, P-63.

৩০। পূর্বোক্ত- পৃ-৬৪।

৩১। সুগত চাকমা- পূর্বোক্ত, পৃ-৮৫।

৩২। জয়নাল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ-৫১।

৩৩। সুগত চাকমা, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬০।

৩৪। Shelly- Ibid, P-57.

৩৫। Aminur Rahman, Ibid, P-161.

৩৬। Shelly, Ibid, P-57.

৩৭। Shelly, Ibid, P-63.

৩৮। CHT Population Census, 1989.

৩৮। Shelly- Ibid, P- 63.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ একটি দেশের অন্যতম জাতীয় শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। একটি দেশ যদি তার ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশকে পরিকল্পিত বা কৌশলীভাবে পরিচালনা করতে পারে তবে তার জাতীয় নিরাপত্তাকে সে আরো সুদৃঢ় করতে পারে অথবা দক্ষ পরিচালনার অভাবে একটি দেশ আরো বেশি অরক্ষিত অথবা প্রতিপক্ষের হুমকি হিসাবে দেখা দিতে পারে। [১]

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত কথাটি প্রযোজ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

অনেকেই বলে থাকেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র একটি দেশ যার কোন উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক গুরুত্ব নেই। সাধারণ দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হলেও আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই ছোট্ট দেশটিকে নিয়েই বৃহৎশক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব আমাদের কাছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে প্রতিফলিত হতে পারে। পাশাপাশি ১৯৯১ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর একটি অতিক্ষুদ্র দল সাধারণ রিলিফ অপারেশনে বাংলাদেশে আগমন করে তখন প্রতিবেশী দেশ ভারত ও তাদের সংবাদ মাধ্যমগুলো এ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। [২] আসলে বাংলাদেশের অবস্থান কয়েকটি ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের দাবিদার। আমাদের দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান অত্যন্ত সহজ ভাষায় কিন্তু গুরুত্বের সাথে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: "মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে উত্তাল তরঙ্গমালা আর উত্তরে রয়েছে হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ। আর এ পর্বতমালার একপাশে রয়েছে ভুটান, নেপাল, সিকিম আর অন্য পাশে মহাচীন। আর পশ্চিমে রয়েছে ভারত এবং পূর্ব দিকে ভারত। আবার দক্ষিণ-পূর্বে বার্মা এর পাশে চায়না, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়া।" [৩]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে আঞ্চলিক এবং বহিঃআঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরুত্ব নিম্নরূপভাবে বুঝা যায়ঃ

প্রথমত, বাংলাদেশ থেকে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগরে খুব সহজেই প্রবেশ করা যায়। ভৌগোলিক এই অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দর কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।[৪]

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তের সাথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত সংযুক্ত। ভারতের এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। অনেক চেষ্টা করেও ভারত এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এইসব বিদ্রোহগুলোকে আরো বেশি উত্তেজিত অথবা কমাতে পারে।[৫]

পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সংলগ্ন হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। যা নিম্নে আলোচিত হল:

যেমন:-

১। বাংলাদেশের চেয়েও বৃহত্তর এ এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

২। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এসব রাজ্যের কোনটিই ভারতের অঙ্গীভূত ছিল না। এমনকি মোগল আমলেও নয়। ঐ রাজ্যগুলো ভারতভুক্ত হয় ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে। ফলে ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া এ এলাকায় তেমন সাফল্য পায়নি।

৩। পুরো এলাকাটি ভূ-বেষ্টিত। সমুদ্রে যাবার নিকটতম পথ বাংলাদেশের উপর দিয়েই।

৪। এ এলাকাটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতের সিংহভাগ তেল, চা, বিয়ার এ এলাকাতে উৎপন্ন হয়।

৫। সমগ্র এলাকাটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে মাত্র সতের কিলোমিটার করিডোর দ্বারা সংযুক্ত। ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতার মুখে পথটির নিরাপত্তাও বিঘ্নিত।

৬। এলাকাটিতে খ্রিস্টান ধর্ম ক্রম প্রসারমান। ইতোমধ্যে মেঘালয় ও মিজোরামে এটা সংখ্যাগরিষ্ট ধর্ম। ফলে এখানকার রাজনীতির সাথে খ্রিস্টান ধর্মের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

৭। এ এলাকাতে অধিবাসীরা নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে মঙ্গোলীয়। ফলে ভারতের মূল অধিবাসীদের সাথে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিভাজন সুস্পষ্ট। নিজ এলাকা পেরিয়ে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে পা রাখলে তারা চিহ্নিত হন বিদেশী রূপে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। সমগ্র এলাকাটি শিল্পে অনুন্নত। ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রগুলো এ এলাকা থেকে অনেক দূরে। ফলে পণ্য পরিবহণ ব্যয়ও অনেক। বাংলাদেশই নিটকতম দেশ যেখান থেকে তারা পণ্য পেতে পারে।

৯। সমগ্র এলাকাটি বৈষম্যের শিকার। চা, তেল ইত্যাদি আসামে উৎপন্ন হলেও সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলোর হেড অফিস কলিকাতায় এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো রাজ্যের বাইরের। ফলে রাজস্ব আয় থেকে এ অঞ্চল বঞ্চিত।

১০। এ এলাকার প্রায় সবগুলো রাজ্যই রাজনৈতিক দিক থেকে অশান্ত। কোন কোন রাজ্যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই চলছে কয়েক দশক ধরে। [৬]

বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের রাজ্য আসামে ULFA (United Liberation Front of Asam), ত্রিপুরায় NLFT (National Liberation Front of Tripura), নাগাল্যাণ্ডে NSCN (National Socialist Council of Nagaland), মিজোরাম এবং মণিপুরেও দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে।

এমনকি বান্দরবান সীমান্ত সংলগ্ন বার্মাতেও কোচিন ও আরাকানীরা দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত সংলগ্ন এসব সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপের অবস্থান হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব দান করেছে। [৬]

ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের সবচেয়ে অরক্ষিত অথচ আঞ্চলিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ভারত মহাসাগরের প্রবেশ পথে বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভৌগোলিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশের অবস্থান তিনটি ভূ-অর্থনৈতিক শক্তির প্রায় সমদূরবর্তী প্রভাবভূমির বলয়ে অবস্থান। এই তিনটি অর্থনৈতিক শক্তি হচ্ছে, ভারত, চীন এবং আসিয়ানভুক্ত অঞ্চল। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-ভাগের বিশেষ তাৎপর্যময় স্থানে অবস্থিত। [৭]

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি সব দিক দিয়ে ভূমি পরিবেষ্টিত। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে সহজে বঙ্গোপসাগরে অবতরণ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলটির সবচেয়ে নিকটতম সমুদ্র উপকূল দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে মাত্র ১২/১৩ কিঃ মিঃ পশ্চিমে কক্সবাজার জেলার উখিয়ার কাছে অবস্থিত। পার্বত্য রাঙ্গামাটির পশ্চিম প্রান্তের কাউখালি থেকে মাত্র ৩০ কিঃ মিঃ দূরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে (কাপ্তাই কিংবা চন্দ্রঘোনা) সড়ক পথে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের দূরত্ব ৫০-৬০ কিঃ মিঃ। কক্সবাজার জেলার সংকীর্ণ এক ফালি ভূ-ভাগে বা কোন স্থানেই পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ কিঃ মিঃ এর চাইতে বেশি প্রশস্ত নয়, তা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে রেখেছে।[৮]

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-রাজনৈতিকভাবে Geo-Political গুরুত্ব বহন করে। সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্নিহিত অবস্থান অত্যন্ত প্রতিকূল। একমাত্র পশ্চিমের বাংলাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া এলাকাটির উত্তর-পূর্ব কিংবা দক্ষিণ পূর্বাংশের ভারত এবং মায়ানমারের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত দুর্গম পার্বত্য বনাবৃত এবং জনবিরল, অনুন্নত ভূ-ভাগের সমষ্টি মাত্র।[৯]

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি উত্তর-পূর্ব দিকে ভারতের মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড আসাম ছাড়িয়ে প্রায় ৬৫০ কিঃ মিঃ দূরে চীনের য়ুনান প্রদেশের সীমান্ত অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে (উঃ) জেলার প্রায় ১১০ কিঃ মিঃ সীমান্ত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন। পার্বত্য রাঙ্গামাটির ২৪০ কিঃ মিঃ সীমানা ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভক্তি নির্দেশ করে এবং পার্বত্য বান্দরবান জেলার প্রায় ১৫৫ কিঃ মিঃ সীমান্ত রেখা মায়ানমারকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আকৃতি অসংবদ্ধ এবং দীর্ঘায়তন। প্রস্থের তুলনায় অঞ্চলটি কয়েকগুণ বেশি দীর্ঘ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বৃহত্তম ভূ-ভাগ থেকে একটি অভিক্ষেপিত ভূ-ভাগ। এসব ভূ-পারিসরিক বৈশিষ্ট্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতার দিক বিবেচ্য।[১০]

পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর-দক্ষিণে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮০ কিঃ মিঃ এবং গড় প্রশস্ততা প্রায় ৫০ কিঃ মিঃ। অঞ্চলটির পূর্ব পশ্চিম দিকে সবচেয়ে প্রশস্ত স্থানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কিঃ মিঃ (রামগড় থেকে বরকল এর উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত) এবং অপ্রশস্ত স্থানের বিস্তৃতি প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ। (চন্দ্রঘোনা থেকে মিজোরামের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত) পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্ত এলাকার অবস্থান থেকে সমুদ্রের নিকটবর্তীতা সমগ্র এলাকাটিকে দান করেছে বিশেষ ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব।[১১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ১৩,১৪৮ বর্গ কিঃ মিঃ। বিশ্বের প্রায় অর্ধ শতাধিক রাষ্ট্রের আয়তন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন অপেক্ষা কম। বিশ্বের প্রায় ২৫-২৬টি অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের আয়তন এবং ভূমি সম্পদের অবস্থান পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ও ভূমি সম্পদের অবস্থার চাইতেও দুর্বল। তবুও ঐসব দেশ অতি সহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার চাইতে অনেকগুণ বেশি জনসংখ্যা ধারণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের তালিকায় নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে।

উদাহরণ স্বরূপ মধ্যপ্রাচ্যের লেবানন, ইসরাইল, সাইপ্রাস, কুয়েত, কাতার অন্যতম। ক্ষুদ্র অথচ পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব ক্ষুদ্র দেশ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদবিহীন তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুর ধারণ করতে পেরেছে বিপুল জনসংখ্যাকে। পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, নগরায়ন আর সমস্ত জনসংখ্যার সুশৃঙ্খল নিরলস কর্মতৎপরতা এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। সমুদ্র বন্দর থেকে মাত্র ৪০/৫০ মাইল বা ৭০/৮০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম একই পথে সমৃদ্ধির চরম উৎকর্ষতা লাভ করে সহজেই বর্তমান জনসংখ্যার পাঁচ গুণ কিংবা তার চাইতেও কয়েকগুণ বেশি জনসংখ্যা ধারণ করতে পারে।[১২]

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে চীন এবং ভারত তাদের স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। সাম্প্রতিককালে এই অঞ্চলে তেল ও গ্যাস সম্পদ আবিষ্কারের ফলে আমেরিকার বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলোর নজর পড়েছে এই এলাকার উপর। রাঙ্গামাটি জেলার ছাত্রছড়িতে সেনাবাহিনীর পাহারায় এক আমেরিকান তেল কোম্পানি গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৩]

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠীরও নজর পড়েছে এই এলাকার উপর। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় অন্তত এক ডজন দেশী-বিদেশী, এন.জি.ও সক্রিয়। এদের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন, সিসিডিপি, কারিতাস, আশা, প্রশিকা, ব্র্যাক, ফাদার টিসি, ইউএনডিপি, বাওপা, ইনকাপ উল্লেখযোগ্য। এসব এনজিওগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই পশ্চিমা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশীয় বেশ কয়েকটি দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সরকারি বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট। পার্বত্য এলাকায় শিক্ষাসেবা ও উন্নয়নের নামে খ্রিস্টবাদ সম্প্রসারণের জন্য কাজ করছে। পার্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি যেমন পাংখো, বোম, নুসাই, চাক, মুরং, খিয়াংদের অধিকাংশই বর্তমানে খ্রিস্টান হয়ে গেছে।[১৪]

এমনকি সন্তু লারমা নিজে কয়েকটি জনসভায় উপজাতিয়দের ধর্মান্তরের অভিযোগ করেছেন খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১। Md. Nuruzzaman, National Security of Bangladesh. *BIISS Journal*. Vol-12, No-3, 1991, P-374.

২। লেঃ আবু রুশদ (অবঃ), বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় নিরাপত্তা, *দৈনিক দিনকাল* ১৫ সেপ্টেম্বর '৯৭।

৩। লেঃ আবু রুশদ (অবঃ), পূর্বোক্ত।

৪। Md. Nuruzzaman, Ibid, P-375.

৫। Md Nuruzzaman, Ibid-375।

৬। দৈনিক ইনকিলাব- ৯ এপ্রিল ৯৭, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, ফিরোজ মাহবুব কামাল।

৭। ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি-আদিযা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১ (পৃ- ১১৭-১১৮)।

৮। পূর্বোক্ত- পৃঃ ১১৮

৯। পূর্বোক্ত- পৃ-১১৯

১০। ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও রাজনীতি।
আহা পার্বত আহা চট্টগ্রাম নামক স্মারকগ্রন্থ- ১৯৯৭, পৃ- ১০৪।

১১। ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, পূর্বোক্ত।

১২। 12 Dec. 1997. Weekly Holiday. The CHT giveaway, By Sadeq Khan,

১৩। দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ১৯৯৮।
ভারতের ৭টি রাজ্য ও পার্বত্য এলাকা নিয়ে নতুন খ্রীস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তানীতির প্রয়োগ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর এর প্রভাব

ভূমিকা

জাতীয় নিরাপত্তা হলো একটি দেশের সবচাইতে স্পর্শকাতর এবং উদ্বেগের বিষয়। কী উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ, এমন কি সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে ভেবে থাকে। সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী, এমনকি সামরিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকেও তাদের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে সবসময় চিন্তিত থাকতে হয়। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে নিরাপত্তার ধারণাটিও পরিবর্তিত হতে পারে। তবে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে উন্নত এবং জাতীয় শক্তিতে বলীয়ান দেশগুলোর চেয়ে অনুন্নত এবং জাতীয় শক্তিতে দুর্বল দেশগুলোকে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। কারণ তারা কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে পারে না। এমনকি তারা অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক হুমকিও সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় না।[১] বাংলাদেশ এর অন্যতম উদাহরণ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নীতি গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন সরকারের আমলে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে নিরাপত্তা নীতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিরক্ষা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে জাতীয় নিরাপত্তা বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

জাতীয় নিরাপত্তা কি

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয় নিরাপত্তা একটি ব্যাপক ও বহুল আলোচিত বিষয়। জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি জাতীয় রাষ্ট্রের মতই একটি পুরাতন বিষয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে আলোচিত হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হয়। কেউ এটাকে ক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকেন, কেউ এটাকে সমানভাবে টিকে থাকাকে, কেউ এটাকে কৌশলগত ভাবে যুদ্ধ এড়ানোকে এবং কেউ এটাকে ক্ষতিকর হুমকি থেকে মুক্ত থাকার অধিকারকে বুঝিয়ে থাকেন। আবার অনেকে জাতীয় নিরাপত্তাকে উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন। ওয়েবস্টার কলেজিয়েট ডিকশনারীতে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত নিরাপত্তার অর্থ হলো "Freedom from exposure to danger, protection, safety or insurance of certainty or protection of defence."

সামরিক দিক থেকে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণা গড়ে ওঠে বাইরের দেশসমূহ থেকে যেসব হুমকি আসে তার উপর ভিত্তি করে। সাধারণত পশ্চিমা বিশ্ব ব্যবস্থা বা শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের নিকট জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার ধারণা বিদেশী শত্রু রাষ্ট্র হতে সামরিক আক্রমণের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। ওয়াল্টার লিপম্যান সর্বপ্রথম নিরাপত্তার বর্হিমুখী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে- "A Nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values, if it wishes to avoid war and is able. If challenged, to mention them by such victory in such a war." [২]

বর্তমানকালের আমেরিকার দুইজন গবেষক ফ্রাংক এন ট্রেগার এবং ফ্রাংক এন সাম্নোনি জাতীয় নিরাপত্তাকে সরকারি নীতির একটি অংশ হিসাবে মনে করেন। তাঁদের মতে, " It is that part of government policy having as its adjective the creation of National and international conditions favourable to the protection or extension of Vital national values against existing and potential adversaries."

বিশিষ্ট বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, "The protection and preservation of the minimum core values of any nation: political independence and integrity." [৪]

জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে পশ্চিমা উন্নত দেশগুলো এবং তুলনামূলক অনুন্নত দেশগুলোকে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তাই জাতীয় নিরাপত্তার ধারণা যে শুধু বহির্মুখী বা সামরিক চরিত্রের হবে তা নয় বরং একেক পর্যায়ের দেশের জন্য একেক রকম সমস্যাকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসাবে মনে করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার যেসব সমস্যা রয়েছে উত্তর বা দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার সমস্যা একই রকম নয়। কারণ উত্তর কোরিয়ার সামরিক কার্যক্রম ও সরাসরি আক্রমণ দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার অন্যতম কারণ। ভারত বা পাকিস্তানের জন্য বৈদেশিক হামলা যেমন ভয়ের ব্যাপার তেমনি অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

বা ধর্মীয় হানাহানিও সমান ভীতিকর। আবার বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অন্যান্য উপসর্গই মূলত উল্লেখের দাবিদার।

তৃতীয় বিশ্বের একজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ আইয়ুব তৃতীয় বিশ্বের নিরাপত্তা সম্পর্কে বলেন, "Despite the rhetoric of many third world leaders the sense of insecurity from which these states and more particularly their regimes suffer emanates to a substantial extent from within their boundaries rather than from outside." [৫]

পাশ্চাত্য উন্নত বিশ্বে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলতে গেলে নেই; যত দিন যাচ্ছে ততই অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে তারা নিজেদেরকে আরো সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। অবশ্য তাদের এই সাফল্য একদিনে আসেনি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তাদেরকে এই পর্যায়ে আসতে হয়েছে। অনেক মতভেদ ভুলে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বোপরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে একটি জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত দেশগুলো যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে একইরকম অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোকে। উন্নত দেশগুলো নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধনের ফলে, তারা শুধু বৈদেশিক সামরিক হামলাকে জাতীয় নিরাপত্তার সমস্যা হিসাবে মনে করছে। এখন আর তাদেরকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোন নজরদারি করতে হয় না বা চিহ্নিত হতে হয় না। বরং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সামরিক খাতে বিপুল সম্পদ বরাদ্দ করছে। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের বহুমুখী সমস্যার ফলে একমাত্র সামরিক ক্ষেত্রে বিপুল সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা অনুন্নত দেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে বলেছিলেন "Security means development. Security is not military hard ware, though it may include it, security is not military force. Though it may involve it. Security is not traditional military activity. Though it may encompass it. Security is development and with out development there can be no security. [৬]

বাংলাদেশের বাস্তবতায় যদিও হুবহু ম্যাকনামারার যুক্তি মানার অবকাশ নেই তবুও নির্দ্বিধায় বলতে হবে যে সশস্ত্র বাহিনীকে বাদ দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেরূপ সম্ভব নয়, তদ্রূপ উন্নয়নকে স্তিমিত করে সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করাও সম্ভব নয়। এ দুটোর সংমিশ্রণেই কেবল বাংলাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

national values রক্ষা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সমরবিশারদ মেজর জেনারেল গোলাম কাদের এর মতে, "In the post Cold war. There is a renewed emphasis on the inter connections of military security with various aspects of the national life political, social, economic and enviromental. The stronger is the society, policy and economy, the lesser is the vulnerability of the country to any security threats. [৭]

ভারতীয় একজন প্রতিরক্ষা গবেষক Pradyot- prad hen এর মতে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণাসমূহকে চিহ্নিত করা যায় :

1. National security is related exclusively to the defence of territorial integrity and national sovereignty.

2. To consider security threats in terms of a nation being completely occupied and its population being subjugated.

3. Security risks are evaluated only in terms of actual use if force, but not in terms of threats of use of force or coercion to use the elegant American phrase "Force without war." [৮]

আবার একটি দেশের নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি সামরিক আগ্রাসন ছাড়াও আরো কয়েকটি খাত থেকে হুমকি আসতে পারে বলে উল্লিখিত গবেষক নির্দেশ করেছেন। এগুলো হলোঃ

১। বিভিন্ন স্বাধীনতাকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বাইরের সমর্থন।

২। একটি রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীতে বিদেশী হস্তক্ষেপ। এর মাঝে বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক তার অর্থনৈতিক নীতিমালা চাপিয়ে দেয়া ও অর্থনৈতিক খাতে শোষণ প্রক্রিয়া অন্যতম।

৩। বিদেশী রাষ্ট্রকর্তৃক আঞ্চলিক পানি সীমা ও এক্টেনডেন ইকোনমিক জোন লংঘন করা এবং খাদ্য তেল প্রযুক্তি সরবরাহে শত্রু দেশ অস্বীকৃতি জানানো ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

৪। নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে সে দেশের প্রতিবেশী ও তাদের নীতিমালা নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করা।[৯]

উল্লিখিত বিশ্লেষণসমূহ ছাড়াও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকির খাতকে প্রাচীন ভারতীয় বিশ্লেষক কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্র বইয়ে চিহ্নিত করেন এভাবেঃ-

ক। বৈদেশিক হুমকি- বৈদেশিক জটিলতা সমৃদ্ধ

খ। অভ্যন্তরীণ হুমকি- বৈদেশিক জটিলতা সমৃদ্ধ

গ। বৈদেশিক হুমকি- অভ্যন্তরীণ জটিলতা সমৃদ্ধ

ঘ। অভ্যন্তরীণ জটিলতা সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ হুমকি।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত নিরাপত্তানীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদানের কারণে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ কাল পরিসরে ভারতকে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসাবে মনে করা হতো না। বরং সেই সময়ে আমরা বিভিন্নভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল ছিলাম। বাংলাদেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে ঐ সময়ে ভারতের নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ K.Subrahmanyan বলেছিলেন, "নিরাপত্তার প্রশ্নে বৈদেশিক পর্যায়ে বাংলাদেশের কোন মাথাব্যথা থাকার কথা নয়, বরং এদেশটির একটি মাত্র মাথাব্যথা হবে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে নিরাপত্তা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন "বাংলাদেশের প্রতি কোন হুমকিকে চিহ্নিত করা হবে ভারতের প্রতি হুমকি হিসাবে- এক্ষেত্রে কোন চুক্তি আর না থাক। [১১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর উপজাতিয় সমস্যাটিও সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। স্বাধীনতা লাভের পর উপজাতিয়রা তাদের ৪ দফা দাবি শেখ মুজিবের নিকট উথাপন করেন। শেখ মুজিব তাদের দাবি দাওয়া প্রত্যাখান করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতা বিরোধিদের উৎখাতের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালের ৭ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়। এর কিছুদিন পর তার সশস্ত্র শাখা শান্তি বাহিনী গঠিত হয় এবং দীঘিনালায় তার জেনারেল হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়। সেনাবাহিনী এবং ইপিআর-এর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর যেসব অস্ত্র জঙ্গলে ফেলে রেখেছিল তা দ্বারা শান্তিবাহিনীকে প্রাথমিকভাবে অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। [১২]

ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ঘোলাটে আকার ধারণ করলে শেখ মুজিব সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জাতীয় নিরাপত্তার সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। শেখ মুজিব সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রে স্মারক নম্বর ২৫/১ ডি-১/৭২ তারিখ ২৭ জুন ১৯৭২ মোতাবেক, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে "অপারেশনাল অঞ্চল" হিসাবে ঘোষণা করেন। [১৩]

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শেখ মুজিবের আমলে এই অঞ্চলে অতিরিক্ত সংখ্যক সেনাবাহিনীর সদস্য এবং পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীও রামগড়ের উত্তরে এবং বান্দরবানের দক্ষিণে বিমান হামলা করেছিল। [১৪] শেখ মুজিবের আমলেই দীঘিনালা আলীকদম ও রুমায় তিনটি সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছিল। কাপ্তাইয়ে একটি নেভাল বেইস স্থাপিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল।[১৫] পরিস্থিতি আরো অবনতি ঘটলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি হতে "বিশেষ অপারেশনাল এলাকা" হিসাবে ঘোষণা করা হয়।[১৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বোম্বে থেকে প্রকাশিত Economic and political weekly তে মন্তব্য করা হয়েছিল এভাবে- "In the Sheikh Muzibs Bangladesh the demand of regional autonomy was taken as a secessionist movement and a massive military operation was carried out in the district. The army and the Rakki Bahini (defence force) people went from one village to one there to search out illegal arms and other repressive measures. To escape torture and persecution hundreds of Tribal people had to flee to the forests.[১৭]

বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সূত্রের খবরে জানা যায় যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা ভারতের সাহায্য সহযোগিতা লাভের আশায় ১৯৭৩-৭৫ সাল পর্যন্ত ভারতের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। দুদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে ভারত তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মাকে সাহায্য করতে রাজি হয়নি।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত নিরাপত্তা নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বিরাট পট পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা নীতিতেও নানা পরিবর্তন সূচিত হয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। ভারতও এই পরিবর্তন সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারত বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। যদিও ভারত স্বীকার করে যে এই পরিবর্তন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা। কিন্তু একই সাথে ভারত এটাও স্বীকার করে যে, এ ধরনের ঘটনায় ভারত বিচলিত না হয়ে পারে না। [১৯]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়েছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের একজন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ রবি নিখির একটি মন্তব্য থেকে। তিনি বলেন, "শেখ মুজিব যখন নিহত হন, তখন ইন্দিরা গান্ধি প্রথমে ঠিক করেছিলেন তিনি হস্তক্ষেপ করবেন। সেনা বাহিনীর তিনটি ডিভিশনে সতর্ক করে দেয়া হলো। [২০]

এ পর্যায়ে ভারত কেন আর বাংলাদেশে আক্রমণ করলো না। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "কিন্তু শেষে সরকার গড়িমশি করলে এবং সুযোগ পেরিয়ে গেল। ফলে হল কি? না বাংলাদেশকে আমরা হাতছাড়া করলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে যুক্তিতে পোল্যাণ্ড ও আফগানিস্তানে এবং আমেরিকা নিকারাগুয়া ও গ্রানাডায় সেনা নামিয়েছিল। সেই যুক্তিতে ভারতও তখন বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করলে তা অসঙ্গত হত না। [২১]

ভারতের আরেক প্রতিরক্ষা গবেষক রাজনৈতিক পরিবর্তনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছিলেন "বাংলাদেশ অপরাপর দক্ষিণ এশীয় দেশের চেয়ে ভারতের জন্য ভিন্ন মাথাব্যথার জন্ম দিয়েছে। কারণ বাংলাদেশ ভারতের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটানোর ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। [২২]

অধ্যাপক জি ডব্লিউ চৌধুরী এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন "ভারত সম্ভবত চিন্তিত ছিল যে বাংলাদেশ ভারতের প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে এবং চীন এই পরিবর্তনে লাভবান হবে। [২৩]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের সাথে সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জিয়া চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নত করে বাংলাদেশের নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন।[২৪]

অধ্যাপক মোঃ নুরুজ্জামান ৭৫ এর পরবর্তী নীতিতে "ঢাকা-বেইজিং-ইসলামাবাদ" শক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন।[২৫]

বাংলাদেশের এই নিরাপত্তা নীতি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর প্রভাব ফেলেছিল। ভারত তার কৌশলগত নীতির কারণে শান্তি বাহিনীকে সহায়তা করা শুরু করল। Chittagong Hill Tracts Commission উপরোক্ত মন্তব্যের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে বলেছেন "It is widely known that the Indian government of Indira Gandhi gave active support to Shanti Bahini insurgents allowing them to operete from bases in India.[২৬]

শান্তি বাহিনী তার সদর দপ্তর দীঘিনালা থেকে সরিয়ে ত্রিপুরায় স্থাপন করেছিল। ১৯৭৫-৭৭ সাল পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর কয়েকটি ব্যাচকে ভারত দেরাদুনে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।[২৭]

ভারত শান্তি বাহিনীকে নভেম্বর ৭৫, মার্চ ৭৭ আগস্ট ৭৯ এবং জুলাই ৮৯ এ পাঁচবার বড় ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছিল।[২৮]

এমনকি ভারত শান্তি বাহিনীকে কৌশলগত সাহায্য ও প্রদান করেছিল। ১৯৭৭ সালে শান্তি বাহিনী প্রথম সশস্ত্র হামলা করেছিল একটি সামরিক কনভয়ের উপর। তাদের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা ও তড়িৎগতিতা দেখে সামরিক বিশেষজ্ঞরা এই আক্রমণকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। একই সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য।[২৯]

জিয়াউর রহমান শান্তি বাহিনীকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রায় এক লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করেন যা এরশাদ সরকার পরবর্তীকালে হুবহু অনুসরণ করেছিল।[৩০]

প্রেসিডেন্ট জিয়া ও প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের নীতি ছিল চীনা নির্ভর সে কারণে তাদের আমলে এই সমস্যার কোন সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এরশাদের প্রতিরক্ষা নীতি যে চীনা নির্ভর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় শেখ হাসিনার একটি সাক্ষাৎকার থেকে। উল্লেখ্য ৯১ সালে বিরোধি দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার দেন। এ ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষক জনাব শ্রীকান্ত মহাপাত্র ভারতীয় স্ট্র্যাটেজিক এ্যানালাইসিস পত্রিকার আগস্ট ৯১ সংখ্যায় শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন যে, বাংলাদেশ চীন থেকে

Dhaka University Institutional Repository

৪০০০ কোটি টাকা দিয়ে এক স্কোয়াড্রন এফ-৭ জঙ্গী বিমান কিনেছে। তার মতে এই তথ্য তাকে দেন শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনা এও বলেন যে, উক্ত অর্থ গোপনে প্রদান করা হয়েছিল যার কোন হিসেব নেই।[৩১]

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বি. এন.পি সরকার ক্ষমতায় এলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার জন্য চেষ্টা চালান। অলি আহমেদের নেতৃত্বে একটি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য। অলি আহমেদের নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটি দুইবার আগরতলায় এবং একবার দিল্লী গিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য। খালেদা জিয়ার আমলে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের জন্য ১০ মে ১৯৯৩ সালে সচিব পর্যায়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল। কিন্তু সে চুক্তি বেশি দিন কার্যকর হয়নি। অলি আহমেদ বলেন বি. এন.পি সরকার প্রথমত ভারতকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। কারণ ভারতই প্রকৃত অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহের উস্কানি ও মদদ দিচ্ছিল। [৩২] অলি আহমেদ বলেন তাঁর নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক কমিটি ভারতের আমলা, সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক ও বিভিন্ন এলিট শ্রেণীর সাথে আলাপ করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে ভারত সরাসরি শান্তি বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং তাদের ৫ থেকে ৭ হাজার নিয়মিত সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর সদস্যকে অর্থ ও গোপন সহায়তা করছে। সুতরাং রাজনৈতিক কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে যদি না ভারত তাদের সহায়তাদান বন্ধ করে বা ভারতকে এই ব্যাপারে নিবৃত্ত না করা যায়, শান্তি বাহিনী বাংলাদেশে তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করবে না।[৩৩]

কিন্তু খালেদা জিয়ার আমলেও প্রতিরক্ষা নীতি ছিল চীনা নির্ভর। খালেদা জিয়ার আমলে প্রতিরক্ষা খাতে সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্রের অন্যতম উৎস ছিল চীন। খালেদা জিয়া চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো উন্নত করার চেষ্টা করেন। বেগম জিয়া জুন ৯১ সালে চীন সফর করেন। বেগম জিয়া নিজে ঢাকা বেইজিং বন্ধুত্বকে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৪]

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ চীনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছিল। অন্যদিকে একজন উর্ধতন চীনা জেনারেল এই বন্ধুত্বকে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিকে আরো সুসংহত করবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ চীনের মধ্যস্থতা কামনা করেছিলেন।[৩৫]

আগেই বলা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার আমলে নিরাপত্তা নীতি ছিল চীনা নির্ভর। যে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান বা শান্তি বাহিনীর সঙ্গে কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ পরবর্তী জাতীয় নিরাপত্তা নীতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় নিরাপত্তা নীতিতে স্পষ্টতই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় সফরে ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে ভারত সফরে গিয়েছিলেন। নয়াদিল্লীতে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের মাটিকে সন্ত্রাসী তৎপরতার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না এবং বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় Insurgent দের জন্য ১৯টি প্রশিক্ষণ শিবির তুলে দেয়া হয়েছে।[৩৬] শেখ হাসিনার এই ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নীতির ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর ৯৬ সালে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আই জে গুজরালের আমন্ত্রণে দিল্লী গিয়েছিলেন। দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি যৌথ ঘোষণা পত্রে Security Related issues এবং চাকমা রিফিউজি ইস্যু ছিল। Security Related issues- এ বলা হয়েছিল It was agreed to further and curb undesirable activities. The Two sides reitered their determination not to allow misuse of their territories for any activity against other[৩৭]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড় ৬ জানুয়ারী ৯৭ সালে দুদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকা আসেন। নয় বছরের মধ্যে কোন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ওটাই ছিল প্রথম ঢাকা সফর। দুই প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক আলোচনায় সীমান্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শীঘ্রই বসার ব্যাপারে সম্মত হন। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে শান্তি বাহিনীর তৎপরতা বন্ধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, অপরদিকে ভারত উত্তর পূর্বাঞ্চলের উলফা ও বড়োদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ করতে চায়।[৩৮]

দেব গৌড়ের ঢাকা সফরের সময় উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনে বাংলাদেশ সম্মত হয়। এই জোটে বাংলাদেশ ভারত ছাড়াও ভুটান ও নেপাল থাকবে। এই জোটটি একটি এন্টি চাইনিজ জোট হবে বলে ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৯]

উপ-আঞ্চলিক জোটে বাংলাদেশের যোগদানের সম্মতি বাংলাদেশের নিরাপত্তার নীতির ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন হিসাবে ধরা হয়ে থাকে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার সত্যতা পাওয়া যায় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মকবুল দার-এর ৩ মার্চ ১৯৯৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

শিলং-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশ ও বার্মার বৈরী বিরোধি ভূমিকায় ভারত সন্তোষ প্রকাশ করেছে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরো জানান যে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৈরী গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশ এবং বার্মা থেকে পালাতে শুরু করেছে। কারণ তিনি বলেন এ দু'দেশের সরকারই সম্প্রতি এই বৈরী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান শুরু করেছে।[৪০]

ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল শংকর রায় চৌধুরী সাত দিনের এক শুভেচ্ছা সফরে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা আসেন। তাঁর এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নীতির ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। শুভেচ্ছা সফরে তিনি বলেছিলেন "As close neighbours we are looking forword to developing in the field of security and we hope the existing relations between the two countries would be strengthened future in the days ahead."[৪১] বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্ক জোরদার করার জন্য কতকগুলো বিষয়ের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এগুলো হলোঃ-

1. Bilateral Security
2. Counter Insurgency and Extradition Treaty
3. Intra and Intra-regional Co-operation.
4. Military Co-operation.

Bilateral Security

দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'As close neighbours we are looking forword to developing co-operation in the field of security and we hope the existing relations between the two countries would be strengthened future in the days ahead.'[৪১]

Counter-insurgency and Extradition Treaty

তিনি দু দেশের মধ্যে অপরাধ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নির্মূলের জন্য অপরাধী প্রত্যর্পন আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Intra and Inter-regional C-operation

তিনি দুদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে আন্ত-আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

Military Co-operation

তিনি দুদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আন্ত-সীমান্ত বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ, চোরাচালান দমনে দুদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তাছাড়া তিনি ভারত থেকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রতিরক্ষা ক্রয়ের সম্ভাবতার উপর জোর দিয়েছেন। যেহেতু ভারত পৃথিবীর অন্যতম অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ তাই বাংলাদেশের চাহিদা মোতাবেক সে ভারত থেকে অস্ত্র কিনতে পারে।[৪২]

জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত এসব নীতির ফলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নীতি পূর্ববর্তী সরকারসমূহের চেয়ে আলাদা।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতির এই পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণকারী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের গ্রেফতার করতে থাকে। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ১০ আগস্ট ৯৭ সালে জিয়া বিমান বন্দর থেকে দুই নেতৃস্থানীয় ULFA এবং ATTF (All Tripra Tribol Force) নেতাকে গ্রেফতার করেছিল। যাদের চিহ্নিত করেছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা।[৪৩]

গ্রেফতারকৃতদের নাম হলো রনি কুমার সাগমা পাসপোর্ট নং- L-0639032 এবং উইলিয়াম মনিন সাগমা, পাসপোর্ট নং- L-0936601 এনাম তারা ছদ্মভাবে ব্যবহার করতো। তাদের আসল নাম হলো অরবিন্দ রাজকাওয়া ও রনজিৎ দেভাবর্মন। অরবিন্দ রাজকাওয়া হলো ULFA-র চেয়ারম্যান এবং রনজিৎ দেভাবর্মন হলো ATTF-র চেয়ারম্যান।[৪৪]

দৈনিক জনকণ্ঠের ১৮ জুলাই ৯৭ সালের একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল যা ১৯৯৬ পরবর্তী বাংলাদেশের নিরাপত্তা নীতি পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। নেত্রকোণায় বিপুল অস্ত্রসহ মণিপুর লিবারেশন আর্মির (MLA) চার সদস্য গ্রেফতার। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৭টি চাইনিজ

Dhaka University Institutional Repository

রাইফেল ৮শ রাউন্ড গুলি, হ্যান্ডারসেকসহ তিনটি বড় ধরনের ম্যাগাজিন। গ্রেফতারকৃতরা জানায় তারা মণিপুর রাজ্যের কে ওয়াই কে এল এর সদস্য।[৪৫]

তাছাড়া ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ULFA নেতা অনুপ চেটিয়াকে শ্যামলী থেকে বাংলাদেশের এক গোয়েন্দা সংস্থা গ্রেফতার করেছিল। অনুপ চেটিয়াকে গ্রেফতার নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে মতদ্বৈততা দেখা দিয়েছিল। ঘটনার সময় বি.বি.সি'র খবরে বলা হয়েছিল যে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে অনুপ চেটিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং আরো বলা হয়েছিল যে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে উভয় দেশ যে সমঝোতায় পৌঁছেছিল কয়েক মাস পূর্বে তার ভিত্তিতে অনুপ চেটিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে তাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে। অবশ্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী অনুপ চেটিয়াকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের জন্য ভারতের কোন অনুরোধের কথা অস্বীকার করেন।

অবশ্য বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে কোন ULFA নেতাকে গ্রেফতারের কথা অস্বীকার করেছিল।[৪৬] (কলকাতা থেকে বি.বি.সি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খবরটি পরিবেশিত)

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে জিয়া, এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার আমলে (৭৫-৯৬) পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে যে নিরাপত্তা নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল শেখ হাসিনা (৯৬-২০০০) সরকারের নিরাপত্তা নীতি তাদের চেয়ে আলাদা প্রকৃতির। এই কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। ভবিষ্যতে যদি নিরাপত্তা নীতির কোন পরিবর্তন দেখা যায় তবে তার প্রভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের উপরে পড়তে বাধ্য। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের সাবেক এক গোয়েন্দা পরিচালকের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। মেজর জেনারেল জেড এ. খান সাবেক পরিচালক আই.বি (ডি. জি. এফ. আই) বিগত ১৬ অক্টোবর ২০০০ সালে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাতে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে জেনারেল জিয়া, এরশাদ ও বেগম জিয়ার শাসনামলে বঙ্গভূমি শান্তি বাহিনী তৎপরতা জোরদার হয়ে উঠেছিল। তারপরও বর্তমান সরকার (আওয়ামী লীগ) ক্ষমতায় আসার পর কিন্তু সব চুপচাপ। কেন এমন হল? আসলে ভারত বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে ডিস্টার্ব করতে চায় না। কারণ তাদের (ভারত) স্বার্থে এ সরকার বহু কিছুই করেছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সরকার যদি ক্ষমতা হারায় তাহলে এসব ইস্যু আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। বিশেষ করে শান্তি বাহিনী সমস্যা পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা শোনা যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রীতি গ্রুপকে ভারত এখন আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে আসছে।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

<u>তথ্যসূত্র ঃ</u>

১। মোঃ আব্দুল হালিম, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি, ব্র্যাক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ- ১৫২।

২। Walter Lippmann- US Foreign Policy, Shield of the Republic, P-51. Boston, 1943. P-51.

৩। Javeed Ahmed Sheikh, Security Perceptions of Weak Nations, A case study of Pakistan in Syed Farooq Hasnat and Anton Palike(eds) Security for weak nations : A multiple perspectve, Lahore, 1986. P-83.

৪। Talukder Maniruzzaman. The Security of Small States in the third world, Canbera papers on Stratagy and defence. No-25. Cambera, Strategic and defence studies center, 1982. P-15.

৫। Mohammad Ayuob, Security in the third world, The worm about to turn? in International Affairs, (London) Vol-60, N-1, Winter 1983/84, P-43.

৬। Robert Mc Narma. The Essence of Security (New York, Harper and Row 1968) p-149.

৭। Maj. Gen Ghulam Quder. The Challenge of Security and Development. *A View from Bangladesh, BIISS*, Journel, Vol-15, No-3,1996, P-214.

৮। Pradyot Pradhan. Indian Security Environment in the 1990s Externel Dimension. Strategic Analysis, Delhi, September-1989, P-649.

৯। Pradyat Pradhan.প্রাগুক্ত- পৃ- ৬৫০।

১০। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, এই বইটির রচনাকাল- খৃষ্টপূর্ব ৩০০ সাল থেকে ৩২১ সালের মধ্যে। এতে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। যিনি ইতিহাসে প্রতারক চানক্য নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

and challenges facing Bangladesh Foreign Policy. Bangladesh Society of International Studies, Dhaka- 1989. P-49.

১২। Amena Mohsin, Military Hegemony and The CHT. Journal of Social Studies, No- 72, April- 1996. P-3.

১৩। দৈনিক দিনকাল- ১০ মে ১৯৯৭- পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের রহস্য।

১৪। Amena Mohsin Ibid P-3.

১৫। Amena Mohsin. Ibid, P-4,

১৬। দৈনিক দিনকাল- ১০ মে ১৯৯৭।

১৭। Corres Pondents Report- 1978, Bangladesh Revolt in The CHT, EPW Bombay, India 29 April, P-123.

১৮। Amena Mohsin Ibid. P-23.

১৯। The Times of London 18 August 75.

২০। রবি নিখি, যুদ্ধে ভারত কেন বার বার হেরেছে, দৈনিক আনন্দ বাজার ১১সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।

২১। রবি নিখি, পূর্বোক্ত।

২২। Prayot Prodhan, India Security Environment in The 1990. Externel Dimension Strategic Analysis, Delhi, Sept- 89. P-656.

২৩। G.W. Chowdhury. Coups and Counter Coups, ORBIS, Winter, 1976, P-1563-95.

২৪। Talukdar Moniruzzaman, Bangladesh in 1975 The Fall of Muzibur Rahman and its aftermath, Asian Survey, Feb-1976, P-128.

২৫। Md. Nuruzzaman, National Security of Bangladesh, BIISS. Journal. Vol-12, No-3, 1991.P-378.

২৬। Life is not ours, CHT Commission, P-16, 1991.

Dhaka University Institutional Repository

২৭। S.Kamaluddin, "A Tangled web of Insurgency." Far Eastern Economic Review, 23, May, 1980. P-34.

২৮। Amena Mohsin, Ibid,-P.5

২৯। Amena Mohsin. Ibid, P-5.

৩০। মোঃ নুরুল আমিন- পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা- ৪২, ফেব্রু-১৯৯২।

৩১। Srikanta Mohapatra- Nationa Security and Armed Forces in Bangladesh Strategic Analysis, August 91, P-602, Delhi.

৩২। অলি আহমেদের সাক্ষাৎকার ১২ ডিসেম্বর, দৈনিক ইনকিলাব, ১৯৯৭।

৩৩। অলি আহমেদ, পূর্বোক্ত।

৩৪। ডঃ তারেক শামসুর রহমান, সাপ্তাহিক রোববার, ঈদ সংখ্যা- ১৯৯৭, (২৫)

৩৫। ডঃ তারেক শামসুর রহমান পূর্বোক্ত।

৩৬। ডঃ আনোয়ার হোসেন, দেব গৌড়ার ঢাকা সফরের প্রেক্ষাপট ও মূল্যায়ন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, বাংলা বাজার পত্রিকা।

৩৭। Journal of International Affairs. Vol-3, No- 1, July- Dec, 1996, P-37.

৩৮। সাপ্তাহিক বিচিত্রা- ১৭ জানুয়ারী ১৯৯৭, অমীমাংসিত অন্যান্য সমস্যা সমাধানে হাসিনা-দেব গৌড়ার আশাবাদ।

৩৯। ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামানের সাক্ষাৎকার, আজকের কগজ ২৯ জুলাই ১৯৯৭।

৪০। আজকের কাগজ ৪ মার্চ ১৯৯৭।

৪১। Prof. Abul Kalam, Bangladesh-India Security, Issue and Perspectives, 5th Sept, Weekly Holiday-1997.

৪২। Prof. Adul Kalam, Ibid.

৪৩। The New Nation 24, August 1997,

৪৪। The New Nation, Ibid.

৪৫। দৈনিক জনকণ্ঠ ১৮ জুলাই ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬। The Daily Star, 3rd January, Top ULFA leader arrested in City. Anup Jetia Chia Glap Barye C.G of ULFA has been arrested, 1998, বি.বি.সি কর্তৃপক্ষ এটি সম্প্রচার

৪৭। দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ অক্টোবর ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহে বহিঃ শক্তির ভূমিকা

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক এবং-ভূ-কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের নিকটও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং বান্দরবান সীমান্ত সংলগ্ন মায়ানমারের কয়েকটি প্রদেশে সশস্ত্র আন্দোলন চলায় বহিঃশক্তি সমূহের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিভিন্ন দেশী বিদেশী এন.জি.ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে প্রবেশ ও আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে চলেছে।

তেল ও গ্যাস আবিষ্কারের সম্ভবনার ফলে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর বিশেষ নজর পড়ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর।

ভারতের নিরাপত্তার নীতি

দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ করে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার পূর্বে ভারতের নিরাপত্তা নীতি এবং কৌশলগত ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত, এ কারণে যে, ভারত হলো দক্ষিণ এশিয়ার সবচাইতে সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালী দেশ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল পৃথিবীর সবচাইতে অস্থিতিশীল অঞ্চল হিসাবেও পরিচিত। এই অঞ্চল বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবেও পরিচিত। দক্ষিণ এশিয়াতে স্থানীয় আঞ্চলিক এবং বিশ্বমানের শক্তির অবস্থান লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিধায় পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের উৎসাহের কারণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থ রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত। অর্থনীতি জনসংখ্যা আয়তন ও সামরিক দিক থেকে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার এক বিরাট শক্তি। ভারতকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ এশিয়ার আবর্তন ঘটে থাকে। ভারতের একজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ বলদেভ রাজা নায়ার এই সম্পর্কে বলেন, From the perspective of its size, population, strategic location the past creativity of its people. Its abundant national resources endownment. Most Indians have seen their as a potential great power. [১]

ভারত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয় ১৯৪৭ সালের পরে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ ত্যাগ করে। ব্রিটিশদের সাথে ভারতীয় কংগ্রেসের পূর্ব থেকেই সখ্য ছিল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে জওহরলাল নেহেরু ও লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে মধুর সম্পর্ক ভারতের রণকৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ব্রিটেনের সাথে ভারতের সখ্য ও পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ও আদর্শগত গুরুত্ব ১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটেনের ক্ষেত্রে রণনীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। পরবর্তীতে ভারত স্বাধীন হবার পর পাশ্চাত্যের সহায়তায় ও সমর্থনে পূর্বে প্রণীত রণনীতির মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রাখে। এই সম্পর্কে ভারতের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এক কূটনৈতিক কে. এম পেনিকার বলেন "An integrated conception of the defence of India and a doctrine of Indian defence supported by a consistant foreign policy (Were) among the two mazor contributions of Britain to the Indian people. [২]

১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটেন ভারতকে মূল কেন্দ্র (Base) ধরে সমগ্র এশিয়ায় ও ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারের জন্য যে রণনীতি নির্ধারণ করেছিল তাকে ব্রিটিশ নিরাপত্তা ডকট্রিন (British Security Doctrine) বলা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষা করা। কারণ এ পথ দিয়েই সকল আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করেছে।

২। ভারতীয় উপমহাদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহকে যে কোন বৈরী শক্তির আওতাধীন হওয়া বা প্রভাব বলয়ে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখা।

৩। ভারত মহাসাগর অঞ্চল ও এর আশে পাশের কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতের রণনীতি ব্রিটিশ রণনীতির প্রতিচ্ছবি হিসাবে প্রণীত হয়। ফলে ভারত প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশসমূহের প্রতিও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে। ভারত ব্রিটিশ নিরাপত্তা নীতিকে মূল প্রতিপাদ্য ধরে Extended Frontier পদ্ধতিতে তার সার্বিক নিরাপত্তা প্রণয়ন করে।

বর্তমান ভারতের একজন প্রখ্যাত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ K.Subramanyam নেহেরুর মনোভাবের প্রতিধনি করে বলেন, "This country with its population size, resources and industrial out put will be a dominent country in the region just as the US. Soviet Union and China happen to be in their respective areas. This is just a fact of geography, economics and technology. [৩]

ভারতের আরেকজন বিখ্যাত কৌশলগত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ভবানী সেন গুপ্তা ভারতের নিরাপত্তা নীতি সম্পর্কে (India Today তে ৩১ আগস্ট ১৯৮৩) বলেন, "India has no intention of intervening in the internel conflict of a South Asian country and strongly oppose any intervention by any country in the internel affairs of others. India will not tolarate an external intervention in a conflict situation has any implicit or explicit anti-Indian impliction. No South Asian government must therefore ask for externel military assistance with an anti-Indian bias from any country. If a south Asian country genuinely needs to deal with as serious internal conflict situation, it should ask help from neighbouring countries including India. The exclusion of India from such a contingency will be considered to be an anti-Indian move on the part of the government concerned. [৪]

Dhaka University Institutional Repository

একথা বলা যায় যে ভারত তার চতুস্পার্শ্বে নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তোলা ও নিরাপত্তার প্রতি যে কোন হুমকিকে তার সীমানার বাইরে অন্যান্য প্রতিবেশীর নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টাতেই নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এ প্রসঙ্গে ভারতের নীতি ও অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশের একজন বিশ্লেষক উল্লেখ করেন।

"The image of India in the region is that of a power which demand habitual obedince from its neighbours. According to the strategic doctrine of India drawn from that of British India, the country's defense perimeter is given not by the boundaries of India but by the outer boundaries of its regional neighbours. The main theme of the doctrine is that South Asia is to be regarded as an Indian backyard. The critical factor is a combination of the comprehensive power potential of the country with a great Power psyche nourished by the Indian political elities and strategic experts. The reference point for India in relation to its international posturse is clearly the type of role assumed by great powers. India under such perception is to be viewed as a dominant country in the region just as the Us, Russia and China in this respective areas." [৫]

ভারত দক্ষিণ এশিয়াকে একটি একক কৌশলগত ইউনিট হিসাবে মনে করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশগুলোর নিরাপত্তা তার নিজের নিরাপত্তা হিসাবে বিবেচনা করে। [৬] এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির ৮.৯ এবং ১০নং অনুচ্ছেদ বলে ভারতের নিরাপত্তা ধারণাকে আরো বেশি গৃহীত করেছে। [৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। Asheque Irshad, Indian Military Power and Policy. BIISS Journal, Vol.- 10, No.-10, 1989, P-389.

৩। Md. Nuruzzaman, National security of Bangladesh, Vol.-12, No.-3, 1991, P.-393.

৩। Ibid. P-397

৪। Bhabani Sen Gupta, The India Doctrine. India Today. 31 August-1983

৫। Iftekharuzzaman. The India Doctrine. Reliance for Bangladesh in M.G. Kabir and Shaukat Hassan (eds) Issues and challenges Facing. Bangladesh Foreign policy. Bangladesh Society of International Studies. 1989. P-34

৬। Lt. Colnel Md. Aminul Karim, Power Politics in the Indian Ocean. Region after the cold war. BIISS Journal Vol-16, No-4. 1995. P-515.

৭। Amena Mohsin. Bangladesh India Relations Limitations and Optians in an Evolving Relationship. Bangladesh South Asia and the World. Emajuddin Ahmed and Abul Kalam (Eds) Academic Publishers, Dhaka, 1992, P-68.

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের ভূ-কৌশলগত স্বার্থ

ভারতের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাট ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের অনেক গবেষক এমনকি ভারতের অনেক গবেষক ও কূটনীতিবিদদের লেখা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ভারতের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারত বিভক্তির সময় চাকমা উপজাতিয়রাও দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবস্থায় ছিল। কিছু চাকমা নেতা পাকিস্তানের পক্ষে থাকার জন্য মত প্রদান করেছিল। চাকমাদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতা, যেমন কামিনি মোহন দেওয়ান এবং স্নেহ কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতভুক্তির জন্য দাবি করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে এলাকাটি অমুসলিম প্রধান। আরো জানা যায় যে তাঁরা কংগ্রেসের উচ্চ পদস্থ অনেক নেতা যেমন মহাত্মাগান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্যাম প্রসাদ মুখার্জি এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতভুক্তির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তাদের দাবির পরিপ্রক্ষিতে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল রাঙ্গামাটিতে পাঠানো হয়েছিল ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য। [১]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব অঞ্চলের ফিরোজপুর জেলার সদর ও জিয়া মহকুমা দুটো ভারতকে প্রদানের বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি করা হয়। [২]

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা নেতাদের মধ্যে কামিনি মোহন দেওয়ান এবং স্নেহ কুমার চাকমা ঐ অঞ্চলটি ভারতভুক্তির দাবি তুলেছিল কিন্তু যখন তাঁরা বুঝতে পারলো যে তাঁদের দাবি আদায় হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তখন তাঁরা The Hillman Association এর ব্যানারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ত্রিপুরা বা কুচবিহারের মতো দেশীয় রাজ্যের মর্যাদার দাবি উত্থাপন করে। তাদের ঐ দাবি প্রত্যাখান হলে স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতীয় পতাকা এবং এর বিপক্ষে স্থানীয় মারমা গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করে। [৩] তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই প্রধান জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের অনৈক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতের কৌশলগত স্বার্থ

সামরিক কৌশলগত দিক থেকে ভারতের নিকট বাংলাদেশের বিরাট ও ব্যাপক কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের ফলে ভারতের নিকট বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের ফলে ভারতের নিকট বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব বেড়ে যায়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহ ভারতের মূলভূখন্ড থেকে মাত্র ১৮ কিঃ মিঃ সংকীর্ণ শিলিগুড়ি করিডোর দ্বারা সংযুক্ত। যা ভবিষ্যতে চীন ভারত যুদ্ধে শক্তিশালী চীনা বাহিনী কর্তৃক তিব্বতের চুম্বী ভেলী থেকে সহজে আক্রান্ত হতে পারে। সামরিক পরিভাষাগত দিক থেকে এটাকে Chicken Neck বলে। Times of India এর সম্পাদকীয়তে এই ব্যাপারে লিখেছে-

The narrow Silliguri carridor could be taken in a couple of house and we could be a precarious position. So the independent of Bangladesh has provided India with strategic security on the Eastern Sector. [৪]

একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত। দৈনিক জনকণ্ঠের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন সাবেক, পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে ব্যবহার করে নাগা ও মিজো বিদ্রোহীরা ভারত বিরোধি যে তৎপরতা চালাচ্ছিল তাতে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। এ ধরনের একটি ধারণা সব মহলে গড়ে উঠেছিল যে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ হয়তো এসব সমস্যার সমাধান দেবে। [৫]

ভারতের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা এফ কাউন্টার ইন্সারজেন্সী বিশারদরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশকে ভারতের স্বার্থ, এমনকি আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় হুমকি বলে মনে করেন। অনেক গবেষক ও সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানা যায় যে, পাকিস্তান আমলে ভারতের নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের গোপন ঘাঁটি এখানে গড়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামু, বলিপাড়া, আলী কদম, দীঘিনালা, মাওদোক, থানচিতে মিজো গেরিলাদের ঘাঁটি ছিল। [৬]

১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকার নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের দমাতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের দমাতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতকে এই সুযোগ এনে দেয়।

এ ব্যাপারে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। এজন্য মুজিব বাহিনীর সংগঠক মেজর জেনারেল উবানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনেও শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠানো হয় মিজো গেরিলাদের বিতাড়নের জন্য পরিচালিত হয় 'অপারেশন ঈগল।'

অপারেশন ঈগলের আড়ালে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি অনুগত সশস্ত্র গেরিলা সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে।[৭] অপারেশন ঈগলের ক্ষেত্রে জেনারেল উবান নিজে 'র' এর প্রধান আর এন কাও এর সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করেছেন। তারা তদানীন্তন মুজিব সরকারকে না জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে মিজোদের অস্ত্র ভান্ডারের খবর কতিপয় চাকমা নেতাদের কাছে জানিয়ে দেয়। শেখ মুজিব যদি কোন দিন ভারতীয় স্বার্থের বিপরীতে কোন কাজ করে বা সোজা পথে না চলেন তখন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এছাড়া মিজো গেরিলাদের কাঠ-টু-সাইজ এর বিষয়টি তো রয়েছেই।[৮]

এর সত্যতা পাওয়া যায় Shaukat Hassan, এর Thesis paper, India-Bangladesh Relation During the Awami League Govt. 1972-1975 থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের দমনে তৎপর হয়। ১৯৭৪ সালে ভারত নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরামে বিদ্রোহ দমনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এবং বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তে এক বিগ্রেড সৈন্য প্রেরণ করার জন্য যাতে বিদ্রোহীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় নিতে না পারে এবং তারা ভারতীয় সেনা কমান্ডের অধীনে থেকে কাজ করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক যুগ্ম সচিবকে সেনা সদর দপ্তর থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নিকট পাঠানো হয় তার সম্মতি প্রদানের জন্য। শেখ মুজিব এ কথা শুনে সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৯]

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় সরকারি মহলে এই আশংকা সব সময় ছিল যে কখনও কোন বাংলাদেশ সরকার প্রত্যক্ষ ভারত বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে উঠবে ভারতের জন্য এক বিপদজনক এলাকা। তাই ভারত অনুগত নয় এমন বাংলাদেশকে তটস্থ রাখার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিয়দের একটি সশস্ত্র সংগঠন প্রয়োজন। তাছাড়া ভারত বিরোধি বাংলাদেশ সরকারকে পররাষ্ট্র নীতি, প্রতিরক্ষা নীতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক চাপের মুখে রাখার জন্য শান্তি বাহিনী একটি ট্রামকার্ড হিসাবে কাজে লাগাতে পারবে।[১০]

তৃতীয়তঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উসকে দেয়ার পিছনে ভারতের আরো একটি বড় উদ্দেশ্য হতে পারে চট্টগ্রাম বন্দর। স্থলবেষ্টিত উত্তর ভারতের এলাকায় কোন সমুদ্র

Dhaka University Institutional Repository

বন্দর না থাকায় পণ্য সমরাস্ত্র পরিবহনে ভারতকে ব্যাপক কৌশলগত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এমনিতেই চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান এমন যে, এটি পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে হিসাবে পরিচিত। আর দিন যতই যাচ্ছে কলকাতা বন্দরের চেয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব ততই বাড়ছে। এদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষিণেই রয়েছে ভারতীয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। যেখানে ভারত গড়ে তুলেছে অত্যাধুনিক নৌ-বিমান ঘাঁটি। এই আন্দামান ঘাটির মাধ্যমে মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত প্রাধান্য বিস্তার করতে তৎপর। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদী ও স্থলবেষ্টিত হবার ফলে ভারত বার্মা থাইল্যাণ্ডসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে প্রত্যাশিত প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে যে কোন মূল্যে ভারত চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে চায়। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে চাবি হিসাবে ভারত ব্যবহার করছে। [১১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো সমুদ্র নিকটবর্তী অঞ্চলের উপর ভারতের কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো চীনের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পূর্বাহ্নেই নিরাপদ করিডোর তৈরি করে রাখা।

চতুর্থতঃ ভারত সরকার আরো একটি কৌশলগত কারণে চাকমাদের সাহায্য প্রদান করতে রাজি হয়, তাহলো মিজো বিদ্রোহীদের মধ্যে চাকমাদের অনুপ্রবেশ করানো এবং মিজোদের সম্পর্কে তথ্য ভারত সরকারকে জানানো। কারণ চাকমা উপজাতিদের আকার আকৃতি ও চেহারা মিজোদের মতো।

১৯৭৫ সালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে চাকমা উপজাতিয় নেতারা ভারত সরকারের সাহায্য চায় এবং তাদের পরিবার পরিজনের ভারতে আশ্রয়ের নিরাপত্তা চায়। ভারত সরকার মিজো বিদ্রোহীদের মধ্যে চাকমাদের অনুপ্রবেশ করিয়ে ভারত সরকারকে তথ্য সরবরাহের প্রস্তাব দেয় বিনিময়ে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়। চাকমা উপজাতিয়রা এই প্রস্তাব মেনে নেয়। [১২]

এই তথ্যের আরো সত্যতা পাওয়া যায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম" শীর্ষক পুস্তক থেকে। পুস্তকে স্বীকার করা হয়েছে যে, "শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের অধ্যায়ে যখন উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা ও মিজো সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের একাংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শুরু করে তখন ভারত সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিকে কাজে লাগিয়ে নাগা ও মিজোদের এই বিদ্রোহকে দমন করার সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু ভারতীয় ভুখণ্ডের অংশ মিজোরাম

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাশেই অবস্থিত সেই হেতু ধরে নেয়া হয়েছিল নাগা ও মিজোদের মধ্যকার খবরাখবর ভারত সরকারকে একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরাই জোগার করতে সাহায্য করতে পারে। সেই মর্মে ভারত সরকার নাগা-মিজোদের বিদ্রোহ দমনে এই জুম্ম জনজাতিকে ব্যবহার করতে শুরু করে।[১৩]

১৯৬৪ সালে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হলে জুম্ম শরণার্থী সমস্যার সূত্রপাত হয়। বেশ কিছু চাকমা ও হাজং সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে নিজস্ব বাসস্থান থেকে উৎখাত করা হলে তারা জীবন রক্ষার তাগিদে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ত্রিপুরায় বহুদিন ধরে বসবাসকারী জুম্ম আরেকটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিতভাবে তারা বসবাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই আশা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরায় বসবাসকারী জুম্ম জনগোষ্ঠীর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সরকার বাংলাদেশ থেকে আগত জুম্ম জনজাতিকে ত্রিপুরায় বসবাস করতে দেবার পথে বাঁধ সেধেছিল। এমতাবস্থায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মতানুসারে স্থির করা হয় বাংলাদেশ থেকে আগত এই শরণার্থীদের পূর্ববর্তী নেফা অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, অধুনা অরুণাচল প্রদেশের জনমানব এলাকায় বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হবে। সম্ভবত ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে চীনের শক্তি মোকাবিলা করার বাস্তব প্রয়াস ছিল ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত। কারণ এই শরণার্থীদের জনমানব বর্জিত এলাকায় বসবাসের সুযোগ দিলে সেখানকার জনসংখ্যা শুধু যে বাড়বে তা নয় এর ফলে ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এই জনজাতি বসবাসের সুযোগ লাভের জন্য ভারত সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে এদের একাংশকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতেও কাজে লাগানো যেতে পারে বলে কেন্দ্রীয় সরকার ভেবেছিল।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। Mizanur Rahman Shelly, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. The Untold Story, Center for Development Research, Dhaka-1992 P-29.

২। S. Mahmud Ali. The Fearful state, Power, People and Internal War in South Asia, 2ed Books, London, 1993 P-176.

৩। Mizanur Rahman, Shelly, Ibid. P-29.

৪। ইন্দোর মালহাত্র- The Times of India, 26 April 1985.

৫। দৈনিক জনকণ্ঠ- ২ এপ্রিল- ১৯৯৬

৬। S. Mahmud Ali. The Fearful State, P-182.

৭। দৈনিক ইনকিলাব ১২ ডিসেম্বর ২০০০.

৮। Ibid.

৯। Shaukat Hassan, India-Bangladesh Relations during the AL Government,Thesis paper. P-190.

১০। লেঃ (অবঃ) আবু রুশদ, শান্তি বাহিনী সমস্যা ও ভারত। আহা পার্বত আহা চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক, ঢাকা-১৯০৭, পৃ- ১৬৮।

১১। লেঃ (অবঃ) আবু রুশদ, পূর্বোক্ত- পৃ- ১৬৯

১২। অশোক রায়না, ইনসাইড 'র', (অধ্যায়- নয়, পৃ- ৯৭), অনুবাদ লেঃ (অঃ) আবু রুশদ,মিলায়ন প্রকাশন, ঢাকা-১৯৯৩, অধ্যায়-৯, পৃ-১৭।

১৩। দেবযানী দত্ত/অনসূয়া রায় চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ, ভারত-১৯৯৬, পৃ- ৬৩।

১৪। দেবযানী দত্ত/অনসুয়া রায় চৌধুরী, পূর্বোক্ত- পৃ- ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি বাহিনীর সমর্থনে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বাহিনীর সমর্থনে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার অনেক প্রমাণ রয়েছে। ভারতের অনেক পত্র-পত্রিকাতে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়, ভারতীয় অনেক গবেষকের নিবন্ধেও ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মেলে। বাংলাদেশের অনেক গবেষক, শান্তি বাহিনীর অনেক সদস্যের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, এমনকি সামরিক গোয়েন্দা প্রধানদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও এর সত্যতা পাওয়া যায়।

১। ভারতীয় সাংবাদিক আশোকা রায়না লিখিত Inside Raw বইতে শান্তি বাহিনীকে ভারতীয় সমর্থনদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বইয়ের নবম অধ্যায়ের সেকশন দুইতে চাকমাদের সমর্থন দানের কথা বলা হয়েছে। এখানে লেখা হয়েছে "চাকমা গেরিলারা মুক্তিবাহিনীর মতো র-অপারেটিভ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিল। সত্তর দশকে বাঙালি মুসলিম জনগণ দরিদ্র চাকমাদের নিকট থেকে সহায় সম্পত্তি ক্রয় আরম্ভ করে এবং এর পর ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়াও একই সাথে চলতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চাকমাদের কিছু সময়ের জন্য সাহায্য করা হয়। কিন্তু মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর আবার সেই ধর্মান্তরকরণ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যায়। তাই তারা বাধ্য হয়ে সাহায্যের আশায় ভারতে আসা শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর মতোই তারা তাদের পুরানো র কন্ট্রাক্টরদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং অবশেষে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়।[১]

২। ভারতের নতুন দিল্লীস্থ Inistitution of Strategic Studies এর রিসার্চ ফেলো অশোক, এ.বিশ্বাস, শান্তি বাহিনীর সাথে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধের নাম ছিল Raws Role in Fur Thering Indian Foreign Policy যা The New Nation পত্রিকায় ৩১-০৮-৯৪ তারিখে হতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "Raw is now involved in training rebels of Chakma Tribes and Shanti Bahini who carry out subversives activities in Bangladesh. It has also unleashed a well-organised plan of psychological warfare creation of polaristion among the arrned forces, anti-Pakinstan propaganda by false allegations of use of Bangladesh territory.[২]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে উপজাতিয় নেতাদের অভিমত

উপজাতিয় অনেক নেতা শান্তি বাহিনীকে সমর্থন দানের জন্য ভারতকে দায়ী করেছেন। সমীরণ দেওয়ান বলেছিলেন-

"শান্তি বাহিনী সমস্যা নয় সমস্যা এখন ভারত"

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান স্থানীয় পরিষদ কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা কালে একথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, "১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের আগে ভারত শান্তি বাহিনীকে কোন সাহায্য সহযোগিতা করেনি। কিন্তু শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর ভারত শান্তি বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ দানের সুযোগ প্রদান করেন। [৩]

২। আরেক উপজাতিয় নেতা গৌতম দেওয়ান ১৩ নভেম্বর ১৯৮৯ সালে বলেছিলেন-

"ভারত উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে আসতে দিচ্ছে না।"

তিনি বলেছেন "শান্তি বাহিনী এবং ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয়গ্রহণকারী উপজাতিয়রা দেশে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু ভারত তাদেরকে দেশে আসতে দিচ্ছে না। অথচ তারা সেখানে অনাহারের মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করছে। [৪]

৩। উপেন্দ্রলাল চাকমা উপজাতিয় শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা ও সাবেক সাংসদ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন-At the end of my life, I am paying heavily for the blunders committed and for betraying my homeland. Over the last fifteen years the Jana Sanghati Samiti has not achieved anything. On the country atrocities of SB have pushed that hill region to a medieval barbarity. Leadership of the SB is now in the hands of Indian inlelligence officials. [৫]

৪। উপজাতিয় একজন লেখক এস.বি. চাকমা লিখিত "উপজাতিয় বিদ্রোহ ও সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিকতা" বইতে ভারতের সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছেন। [৬]

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি বাহিনী সম্পর্কে বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (ডি.জি.এফ. আই) প্রধানদের মতামত

১। মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. এ. হালিম সাবেক মহা-পরিচালক (ডি.জি.এফ.আই) এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন "শান্তি বাহিনী এবং বঙ্গভূমি আন্দোলন নিঃসন্দেহে র-এর সৃষ্টি। র এদের সক্রিয়াভাবে সাহায্য করে থাকে। এর সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শান্তি বাহিনী এবং বঙ্গভূমি কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিচালনা র এর দায়িত্বে হয়ে থাকে। এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি বাহিনী এবং বঙ্গভূমির সপক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার জন্যও র সভা সেমিনার করে থাকে। [৭]

২। মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. এ. মতিন সাবেক মহা-পরিচালক (ডি.জি.এফ.আই) এক সাক্ষাৎকারে শান্তি বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন "একথা আমাদের কারোই অজানা নয় যে র এর সক্রিয় সাহায্য ও মদদপুষ্ট হয়েই তথাকথিত শান্তি বাহিনী নামধারী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী চাকমারা ভারতের অভ্যন্তরে ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত তেত্রিশটিরও অধিক ক্যাম্পে অবস্থান করেছে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে। সেখানে ভারতীয় B.S.F এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কার্য পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এসব ক্যাম্পে ছিল তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এসব ক্যাম্পে থেকেই বিদ্রোহী চাকমারা ভারতীয় B.S.F কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কাজ পরিচালনা করেছে। [৮]

৩। বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) আমিনুল হক সাবেক মহা-পরিচালক জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (N.S.I) শান্তি বাহিনী সম্পর্কে বলেছিলেন "শান্তি বাহিনী বা বঙ্গভূমি ইস্যু তো র এর সাহায্য ছাড়া অস্তিত্ব থাকারই কথা নয়। শান্তি বাহিনীর অস্ত্র গোলাবারুদ রসদপত্র ক্রয়ের সোর্স বা উৎস কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই ভারতের নাম চলে আসে। [৯]

৪। মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড. এ. খান সাবেক পরিচালক (আই. বি) (ডি. জি. এফ. আই) শান্তি বাহিনী সম্পর্কে বলেছেন- "আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। আমার এবং আমার সহকর্মীদের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে শান্তি বাহিনী সমস্যা তৈরির পিছনে র এর হাত রয়েছে। দেখা যেত নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ দপ্তরে যখন সভা হতো বা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যখন মানবাধিকার সংক্রান্ত সেমিনার বা আলোচনা হতো সেখানে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা প্রচার পুস্তিকা লিফলেট নিয়ে হাজির হত যার প্রায় সবগুলো ছাপা হতো ভারতে। প্রশ্ন হচ্ছে ঐ সম্মেলনে উপস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া ও প্রচারণা চালানোর অর্থ তারা কোথা থেকে পেত? এছাড়া তারা বাংলাদেশী। এই পরিচয়ে যেত না, যেত অন্য পরিচয়ে। এই পরিচিতি কারা দিত? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই পাওয়া যাবে র এর নাম। [১০]

তাছাড়া মেজর জেনারেল (অবঃ) মতব্বত জান চৌধুরী সাবেক মহা-পরিচালক (ডি.জি.এফ.আই) বিগত ১৫ অক্টোবর ২০০০ সালে ইনকিলাবের সাথে এক সাক্ষাৎকারে শান্তি বাহিনী সম্পর্কে একই তথ্য প্রদান করেছেন। [১১]

মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম কাদের সাবেক মহা-পরিচালক (এন.এস.আই) বিগত ১২ অক্টোবর ২০০০ সালে দৈনিক ইনকিলাবের সাথে এক সাক্ষাৎকারে শান্তি বাহিনী সম্পর্কে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। [১২]

বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের মতামত

বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী ও গবেষক শান্তি বাহিনীর সহায়তায় পেছনে ভারতের সমর্থন রয়েছে বলে মতামত প্রদান করেছেন।

অধ্যাপক নুরুল আমিন তার Secessionist Movement in Chittagong Hill Tracts নামক নিবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

অধ্যাপক ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক আফতাব আহমেদ, অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ, ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, ডঃ আমেনা মহসিন, অধ্যাপক শহীদুজ্জামান, অধ্যাপক আর আই চৌধুরী প্রমুখ গবেষক শান্তি বাহিনীর সহায়তার জন্য ভারতের কথা উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১। অশোক রায়না, ইনসাইড র অধ্যায়-৯, অনুবাদ লেঃ (অবঃ) আবু রুশদ, মিলারস প্রকাশন, ঢাকা-১৯৯৩ (পৃ- ৯৬—৯৭)

২। অশোক এ. বিশ্বাস- Raw;Role in the Furthering Indian Foreign Policy. Institution of the Strategic Studies, Delhi.The new Nation, 31 August, 1994.

৩। দৈনিক ইনকিলাব ১১ইং নভেম্বর ১৯৮৯, শান্তি বাহিনী সমস্যা নয়, সমস্যা এখন

৪। দৈনিক ইনকিলাব ১৩ নভেম্বর ১৯৮৯, ভারত উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে আসতে বাধা দিচ্ছে

৫। The New Nation October 1. 1991.

৬। এস.বি. চাকমা উপজাতির নেতৃত্বঃ সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিকথা, প্রকাশের স্থান ও সময় অনুলেখিত।

৭। দৈনিক ইনকিলাব ১৩ অক্টোবর ২০০০।

৮। দৈনিক ইনকিলাব ১৪ অক্টোবর ২০০০।

১১। দৈনিক ইনকিলাব ১৫ অক্টোবর ২০০০।

১২। দৈনিক ইনকিলাব ১২ অক্টোবর ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে ভারতের ভূ-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আই. জে. গুজরালের একটি ভাষণ থেকে। মিঃ গুজরাল ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে লন্ডনের Royal Institute of International Affairs এ ভারতের পররাষ্ট্রর নীতির উপর এক একাডেমিক ভাষণ দান করেন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল Foreign Policy Objectives of Indian United Front Government।

এই প্রবন্ধে ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন "Put back the economy of Nort-Eastern India by a quarter century as it lost its markets, transit routes and arteries of communication and entrepot, Chittagong, to be come on all but landlocked cul-de-sac. [১]

উপর্যুক্ত ভাষণের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে চট্টগ্রাম বন্দর হারানোর ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের অর্থনীতি পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেছে।

(২) ভারতের ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থের আরো একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরীর ভোরের কাগজের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি ভারতের সাথে সম্পর্ক আরো ভাল করার জন্য ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের আহ্বান জানান। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন "শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের বিদ্রোহীরা হোঁচট খেয়েছে। বিশেষ করে বিদ্রোহীরা বাংলাদেশের ভূ-খন্ড ব্যবহার করতে পারবে না। শেখ হাসিনার এ ঘোষণা খুব ভাল কাজ করেছে।"

সমর চৌধুরী বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। বাংলাদেশ জানায় সমস্যাটি মিটে গেছে। শরণার্থী সমস্যাও সমাধানের দিকে এগুচ্ছে। এখন সম্পর্কটা আরো ভাল করার জন্য আমাদের দিকেও দেখা উচিত। বাংলাদেশের সংগে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য দরকার ট্রানজিট দরকার।" [২]

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ভারতের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের আরো প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের কয়েকজন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের বক্তব্যের মাধ্যমে। তাঁরা বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম কাদের, সাবেক মহা-পরিচালক জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এন.এস.আই), র এর উদ্দেশ্য সম্পর্ক বলেছেন " এ উপমহাদেশে ক্ষমতার ভারসাম্য রাজনীতি কূটনৈতিক মেরুকরণের প্রকৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশে র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ভারতীয় নীতি নির্ধারক মহলের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে গোপন সহায়তা প্রদান করা। তাঁর মতে দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে ভারতীয় কৌশলবিদগণ একাডেমিকেলি যে চিন্তা চেতনা পোষণ করেন র এর দায়িত্ব হচ্ছে সেসবের বাস্তবায়নে ইন্টিলিজেন্স তৎপরতা পরিচালনা করা।

এক্ষেত্রে র এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সকল পর্যায়ে বাংলাদেশকে ভারতের বাধ্যগত রাখা, যাতে এদেশে সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা থেকে শুরু করে রাজনীতি, সমরনীতি ও অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই ভারতের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে গোলাম কাদেরের অভিমত র এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বন্ধু প্রতীম দেশগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশকে দূরে সরিয়ে আনা, বন্ধুহীন করে তোলা। যাতে এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়।[৩]

সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (ডি.জি.এফ.আই) সাবেক মহা-পরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুল মতিন (বীর প্রতীক) এর মতে র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন- আমাদের দেশে র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাময়িক ও সুদূর প্রসারী এ দুইভাগে বিভক্ত। সাময়িক উদ্দেশ্য হলো- এদেশের মাটি ও মানুষকে ভারতমুখী ও ভারতনির্ভর করে তোলা এবং একই সাথে এ দেশকে বাইরের কোন শক্তি বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রভাব বলয় থেকে সদা মুক্ত রাখা। অন্যদিকে সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য হচ্ছে To implement the Indian version of the Monroe Doctrine which New Delhi has been purseing in Practice in order to spread an Indian umbrella on the plea of regional security over all of South Asia. অর্থাৎ আঞ্চলিক নিরাপত্তা

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিতকরণের নামে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বলয়ের বিস্তার সাধন কল্পে মনরো ডকট্রিন (প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো কর্তক অনুসৃত মতবাদ) এর অনুরূপ নিউ দিল্লী কর্তৃক ডকট্রিন বা মতবাদকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করা।[৪]

(৩) বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) আমিনুল হক সাবেক মহা-পরিচালক জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এন.এস.আই) এর মতে র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ভারতের বাংলাভাষী রাজ্য পশ্চিম বাংলা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত সাতকন্যার মাঝে অবস্থিত বাংলাদেশকে তার (ভারতের) প্রভাব বলয়ে রাখা, যাতে সেখানে ভারত বৈরী কোন শক্তির সাথে এমন কোন সম্পর্ক গড়ে না উঠে। যা এ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য ভারত এ জন্য সব সময় বন্ধু ভাবাপন্ন বাংলাদেশের কথা বলে। আসলে এ বন্ধু ভাবাপন্ন কথার অর্থ হচ্ছে- বাংলাদেশ এমন পররাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি গ্রহণ করুক যা ভারতের নীতি আদর্শের সমান্তরাল। ভারত চায় বাংলাদেশ তাদের পক্ষে থাকুক। এদেশের পররাষ্ট্র নীতি হোক ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অনুকূল। এজন্য দরকার একটা বন্ধু প্রতীম সরকার এবং সে রকম একটি সরকার গঠন যা ভারতের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণে চাপ প্রয়োগের দায়িত্ব হচ্ছে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র এর।[৫]

(৪) সাবেক মহা-পরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) এম.এ.হালিম (ডি.জি.এফ.আই) এর মতে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার করা ও সব ব্যাপারে বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে তোলা। তিনি আরো মনে করেন মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করলেও র বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণকে ভারত অনুরাগী করে গড়ে তুলে তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।[৬]

তাছাড়া সাবেক পরিচালক ডি.জি.এফ.আই মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড. এ. খান এবং সাবেক মহা-পরিচালক (ডি.জি.এফ.আই) মেজর জেনারেল (অবঃ) মহব্বত জান চৌধুরী বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিশিষ্ট গবেষক ও সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন তাঁর পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বরূপ সন্ধান নামক পুস্তকে ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে লিখেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

১। ভারত কখনই একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাংলাদেশ কামনা করে না। ভারত জানে যে শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি যুদ্ধময় পরিস্থিতি বজায় থাকলে বাংলাদেশকে তার অতি মহার্ঘ-বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ উন্নয়ন খাতে ব্যয় না করে পার্বত্য অঞ্চল রক্ষার কাজে ব্যয় করতে হবে। ফলে দিন দিন এদেশ অর্থনৈতিকভাবে এমন ভয়াবহ সংকটের মুখে পতিত হবে যে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজ থেকে ছেড়ে দেবে। কারণ বাংলাদেশের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ভারত সরকার এখনও শান্তি বাহিনীর একাংশকে (প্রীতি গ্রুপ) ভারতে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে রেখেছে যাতে প্রয়োজনে এগ্রুপকে আবার কাজে লাগাতে পারে।

২। বাংলাদেশ যেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে কখনই ভারত বিরোধি শিবিরের সাথে হাত মিলাতে না পারে সে জন্য বাংলাদেশের ওপর চাপ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারত শান্তি বাহিনীকে ব্যবহার করেছে।

৩। যদি কোন ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তবুও কথিত এই রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ উভয়ের একটিও পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে না। তখন তারা হয়তো ভুটানের মতো আশ্রিত রাজ্য হিসাবে টিকে থাকবে অথবা সিকিমের মতো সম্পূর্ণরূপে ভারতের সাথে মিশে যাবে।

৪। উপর্যুক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচল ইত্যাদি সমুদ্র সংযোগবিহীন ভূমিবেষ্টিত রাজ্যসমূহে বিরাজমান বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে।

৫। যদি কথিত চাকমা রাষ্ট্র স্বাধীন সত্তা নিয়ে টিকেও থাকে তথাপি ঐ রাষ্ট্রের উপর ভারতের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে। পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে চীনের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের মোকাবিলা করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সমরাস্ত্র অতি দ্রুত পূর্বাঞ্চলে প্রেরণ করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড সমগ্র পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পর্বত সংকুল সুদীর্ঘ আড়াই হাজার কিলোমিটার পথ জুড়ে কলকাতা বন্দর হতে আনা নেয়া হয়। এতে পরিবহণ খরচ অত্যধিক বেড়ে যায় এবং সময় নষ্ট হয়। বর্তমানে পূর্বাঞ্চলে যে সামগ্রী প্রেরণে পরিবহণ ব্যয় আড়াই টাকা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেলে ঐ পরিবহণ ব্যয় হবে মাত্র দশ পয়সা।

এই কারণে ভারতের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন যে পশ্চাদপদ পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন দমন এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর তথা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ভারতের নিয়ন্ত্রণে আনা একান্ত অপরিহার্য।

৭। ভারতের কর্তাব্যক্তিরা আরো মনে করেন যে একটি স্থিতিশীল সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তাঁদের পরিকল্পিত অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার পথেতো বটেই ভারতের মানচিত্র নিয়ে টিকে থাকার জন্যও মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশ টিকে থাকলে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের শোষিত বঞ্চিত রাজ্যসমূহে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আরো তীব্রতর হতে পারে। [৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১। দৈনিক দিনকাল ২৩ এপ্রিল ১৯৯৭।

২। দৈনিক ভোরের কাগজ ৬ মার্চ ১৯৯৭।

৩। দৈনিক ইনকিলাব ১২ অক্টোবর ২০০০।

৪। দৈনিক ইনকিলাব ১৪ অক্টোবর ২০০০।

৫। দৈনিক ইনকিলাব ১১ অক্টোবর ২০০০।

৬। দৈনিক ইনকিলাব ১৩ অক্টোবর ২০০০।

৭। জয়নাল আবেদীন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সরূপ সন্ধান এর আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ, পৃ-৯৯-১০০ থেকে উদ্বৃত।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভারতের ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহে সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি ছিল ভারতের, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি শান্তি চুক্তি সম্পাদনেও ভারতের একটি পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। ভারতের আন্তরিক সদিচ্ছা ছাড়া একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না বলে বাংলাদেশের অনেক গবেষক মতামত প্রদান করেছেন।

ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তার "শান্তি অশান্তির দোলাচলে পার্বত্য চট্টগ্রাম" নামক নিবন্ধে, যা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রাতে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি লিখেছেন "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি বহিঃস্থ প্রেক্ষাপটে আছে এবং যা স্পষ্ট হয়ে উঠে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার সময়ে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদের নেগোসিয়েশন স্টাইল থেকে। এ প্রসংগে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বাবু উপেন্দ্রলাল চাকমার বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"আমি বার বার লক্ষ্য করেছি যে যদিওবা ১ম হতে ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকগুলো তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে যেতে পারতেন না। সেই সিদ্ধান্তটুকু দেওয়ার জন্য তাদের বার বার পরবর্তী বৈঠকের প্রয়োজন পড়ে। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে যখন আসে তখন তো তারা তাদের দলের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা নিয়েই আসে, কিন্তু সিদ্ধান্ত দিতে পারে না কেন? এতে আমার মনে হয় কোন একটা অদৃশ্য শক্তি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের ইঙ্গিত ছাড়া তারা কোন সিদ্ধান্তই সেটা বলে দিতে পারে না।" [১]

এ প্রসঙ্গে ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মন্তব্য করেছেন- অদৃশ্য শক্তির ভূমিকা আছে এবং কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাকে বাধ্য করতে হবে এই ভূমিকা পালন না করতে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো একটি মন্তব্য করেছেন যে শান্তি বাহিনী সমস্যা জিইয়ে রাখলে তার নিজের এলাকার সুদূর প্রসারী অশুভ ফল সৃষ্টি হবে। সেটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। [২]

এ নিবন্ধে তিনি স্পষ্টতই ভারতের কথা উল্লেখ করেছেন। এরশাদ সরকারের পতনের পর বি.এন.পি সরকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বি.এন.পি সরকারের সাথে ভারতের সম্পর্ক কয়েকটি কারণে খারাপ হওয়ার কারণে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। যা চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের আন্তরিক সদিচ্ছা ছাড়া যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় তার সমর্থন পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারের মাধ্যমে। বিগত ১৪ আগস্ট ১৯৯৭ সালে আন্তর্জাতিক অধ্যায়ন সমিতি কর্তৃক আয়োজিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কারণ ও প্রতিকার একটি কৌশলগত প্রতিকার" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেমিনারে বক্তারা বলেছিলেন "ভারতের আন্তরিক সদিচ্ছা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনই শান্তি আসবে না। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সৃষ্টির পিছনে ভারতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এজন্য সন্তু লারমা নিজেই স্বীকার করেছিলেন "বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়ায় ভারত জড়িত না হলে স্থায়ী শান্তির আশা অবান্তর"।[৩]

সেমিনারে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকের দেশের যে কোন জায়গায় বসবাস করার অধিকার সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কেবল চাকমা উপজাতিয়রা রহস্যজনক কারণে তা মেনে নিতে পারেনি।

শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়ার ৬ জানুয়ারী ১৯৯৭ সালের বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া দুদিনের এক রাষ্ট্রীয় সফরে ৬ জানুয়ারী ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে আসেন। দুই প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক আলোচনায় সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা মোকাবিলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শীঘ্রই বসার ব্যাপারে সম্মত হন। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে শান্তি বাহিনীর তৎপরতা বন্ধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অপর দিকে ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উলফা ও বেন্ডোদের মতো সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ করতে চায়।[৪]

দুই প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের পর যে শান্তি আলোচনার পথ সুগম হয়েছিল এই সম্পর্কে প্রখ্যাত সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির তাঁর "পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির আলোচনা বনাম অশান্তির আন্দোলন" নামক নিবন্ধে লিখেছেন ১৯৯৬ এ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বাংলাদেশে আশ্রয় প্রশ্রয় ও প্রশিক্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়ার বৈঠকের পর ভারতও শান্তি বাহিনী সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করে এবং এভাবেই শান্তি আলোচনার পথ সুগম হয়।[৫]

সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন আন্তর্জাতিক অধ্যয়ন সমিতি বাংলাদেশের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবুল কালাম ও B.I.I.S.S

Dhaka University Institutional Repository

(Bangladesh Institutue of International and Strategic Studies) এর গবেষক ডঃ আব্দুর রব খান, ডঃ শহীদুজ্জামান, ডঃ আমেনা মহসিন, অধ্যাপক মোঃ নুরুজ্জামান, সাংবাদিক আতিকুর রহমান, মোঃ ফেরদৌস হোসেন, ডঃ শওকত আরা হোসেন ও অধ্যাপিকা পারভীন হাসান।

দেব গৌড়ার ঢাকা সফরের পর বাংলাদেশ সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের প্রতি বৈরী মনোভাব গ্রহণ করে এবং তাদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেয়। এই কথার সত্যতা পাওয়া যায় ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মকবুল দার এর ৩ মার্চ ১৯৯৭ সালে শিলং শহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি বাংলাদেশ বৈরী বিরোধি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেছিলেন যে বাংলাদেশ ও বার্মার বৈরী বিরোধি ভূমিকায় ভারত সন্তোষ প্রকাশ করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশ এবং বার্মা থেকে পালাতে শুরু করেছে। কারণ তিনি বলেন এ দুদেশের সরকারই সম্প্রতি এই বৈরী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান শুরু করেছে। [৬]

বাংলাদেশ সরকার যে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে না তার আরো একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় এক জেনারেলের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ রাবিড় বলেছেন "বহু বছর ধরে বাংলাদেশে, পূর্ব ভারতের যে বিদ্রোহীরা আশ্রয় নিয়েছিল বর্তমানে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন বাংলাদেশ সরকার বাকি বিদ্রোহীদেরও তাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।" আসামের গোহাটিতে গতকাল ৫ মার্চ ৯৭ জেনারেল রাবিড় সাংবাদিকদের জানান যে উত্তর পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। তিনি আরো বলেন "বাংলাদেশে বিদ্রোহীদের শিবির থেকে কিছুসংখ্যক জঙ্গীবাদী আস্তে আস্তে সরে আসতে শুরু করেছে।" তিনি জানান এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। সব জঙ্গীবাদী এখনও শিবির ত্যাগ করেনি। তবে তিনি জানান যে অগ্রগতি হয়েছে তা অত্যন্ত ভাল এবং তা স্বাগত জানানোর মতোই। [৭]

বাংলাদেশ ভারতের এসব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারত সরকারও ত্রিপুরায় অবস্থিত শান্তি বাহিনীর ক্যাম্পগুলো ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেয় এবং চাকমা শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরত যাবার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এই কথার সত্যতা পাওয়া যায় ত্রিপুরায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ভোরের কাগজের এক প্রতিনিধির ৫ মার্চ ১৯৯৭ সালের এক

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। ঐ সংবাদের শিরোনাম ছিল "ভোরের কাগজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরার শান্তি বাহিনীর ক্যাম্পগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ।"

এই সংবাদ আজকের কাগজ ৮ জুন ১৯৯৭ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সংবাদের শিরোনাম ছিল "বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী জঙ্গীবাদীদের তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে" ভারতীয় জেনারেল রাবিড়।

ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী শান্তি বাহিনী সদস্যদের ক্যাম্পগুলো ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাটিতে ক্যাম্পগুলো আর থাকবে না। ভোরের কাগজের সাথে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ত্রিপুরা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও রাজস্বমন্ত্রী সনর চৌধুরী সাংবাদিকদের একথা বলেছেন।[৮]

উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন "কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে কদিন আগে রাজ্য সরকার ত্রিপুরার শান্তি বাহিনীর যেসব ক্যাম্প রয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। এসব ক্যাম্প এখন আর থাকার কথা নয়। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত হয়েছে কোন ক্যাম্প থাকবে না।[৯]

উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেছিলেন যে শেখ হাসিনার সরকার ভারতের কোন বিদ্রোহীদের বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ব্যবহার করতে দিচ্ছে না।

উপর্যুক্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে ভারত সরকারও শান্তি বাহিনীর উপর চাপ প্রয়োগ করছিল। ফলে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটা আপস রফা করা সম্ভব হয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির শান্তি চুক্তি সম্পাদনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল দুটি। যেমনঃ-

১। জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবি মানা।

২। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ দফা দাবিনামাঃ

১৯৮৭ সালের ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত তৎকালীন সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় বৈঠকে জনসংহতি সমিতি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের নিকট পাঁচ দফা দাবি নামা পেশ করে। তাদের প্রথম ও প্রধান দাবি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান পূর্বক স্বায়ত্বশাসন প্রদান। [১০]

জনসংহতি সমিতি ১৯৮৮ সালের ১৯ জুন অনুষ্ঠিত ৫ম বৈঠক পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে অটল থাকে। ১৯৮৮ সালের ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সরকারের সাথে ৬ষ্ঠ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি পাঁচ দফা দাবি নামা সংশোধন করে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি উত্থাপন করে। জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে রূপান্তরিত করলেও মূল পাঁচ দফা দাবি নামার অপরাপর সমুদয় দাবি অপরিবর্তিত থাকে। [১১]

সমিতি পরে ১৯৯২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সামান্য সংশোধিত আকারে একই ধরনের দাবি পেশ করে। জনসংহতি সমিতি পাঁচ দফা দাবির অধীনে মোট ৪৭টি দাবি উপদাবি উত্থাপন করে। [১২]

জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবি নামা নিম্নরূপ

প্রথম দফা দাবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া-

১। পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।

২। আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

৩। এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে।

৪। আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি প্রবিধান, উপবিধি, আদেশ নোটিশ প্রণয়ন জারী ও কার্যকর করার ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

৫। পরিষদের তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবার ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় দফা দাবি

১। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্মল্যাণ্ড (Jummaland) নামে পরিচিত করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা।

তৃতীয় দফা দাবি

১। ১৭ আগস্ট ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনী ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

২। ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল জুম্ম নরনারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলকে সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চতুর্থ দফা দাবিঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকারের মামলা অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতিতে যদি কোন বিচার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই সব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও উক্ত বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম দফা দাবিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপুর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা একান্ত অপরিহার্য। তৎ পরিপ্রেক্ষিতেঃ-

১। সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে আটককৃত সকল জুম্ম নরনারীকে বিনাশর্তে অনতিবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকীকরণ করা।

৩। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (B.D.R) ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্পসমূহ পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।[১৩]

এরশাদ সরকার এবং খালেদা জিয়া সরকারের আমলে জনসংহতি সমিতি পাঁচ দফা দাবি নামা থেকে সরে আসেনি। ফলে এসব সরকারের পক্ষে একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ পাঁচ দফা মানতে হলে সরকারকে সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন হতো। তাছাড়া ঐ সব সরকারের সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের জটিলতার কারণেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির প্রথম দফা আলোচনা

আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ২১ এবং ২৪ শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে। দুদিনের দু দফা ৬ ঘন্টা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন "আন্তরিক পরিবেশে সৌহার্দপুর্ণ ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে আমরা মোটামুটি ঐকমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। আগামী ২৫ জানুয়ারি বৈঠকে জাতিকে একটি চূড়ান্ত রূপরেখা দিতে পারবো।"

জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা বলেন, "এটি অনেক দিনের পুরানো সমস্যা। যেহেতু বর্তমান সরকার আন্তরিক তাই সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমরা আলোচনা করেছি। মোটামুটি আলোচনা ফলপ্রসূ ও অর্থবহ হয়েছে।" [১৪]

যদিও আলোচনার বিষয়বস্তু গোপন রাখা হয়েছিল তথাপি ৫ দফা দাবিনামা এবং শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। [১৫]

আজকের কাগজ প্রথম দফা মিটিং সম্পর্কে লিখেছে "৫ দফার রূপরেখা সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।" [১৬]

জনসংহতি সমিতির নেতারা ৫ দফা সম্পর্কে বলেছিলেন "আমরা চেয়েছি বেশি সরকার কি দেয় দেখি।" [১৭]

তবে সরকারের এক কর্মকর্তা বলেছিলেন ৫ দফার সবটুকু সরকারের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।[১৮]

দ্বিতীয় দফা আলোচনা

জনসংহতি সমিতির সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ২৫ থেকে ২৭ জানুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে দ্বিতীয় দফা আলোচনা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে দুপক্ষ আশাবাদী হলেও জনসংহতি সমিতি তাদের দাবির ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ৫ দফা দাবির ব্যাপারে অনড় থাকে। ঐ বৈঠকে দুপক্ষ যৌথ শান্তি চুক্তি উপস্থাপনের কথা থাকলেও জনসংহতি সমিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। [১৯]

দ্বিতীয় দফা বৈঠক সম্পর্কে আজকের কাগজ লিখেছে যে ভূমি সমস্যা এবং স্যাটেলার প্রত্যাহারের সমস্যা ছাড়া বাকি বিষয়গুলোতে মোটামুটি একমত। [২০]

দ্বিতীয় দফা আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় যে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের জন্য সরকারি দল শীঘ্রই ত্রিপুরা যাবে। [২১]

ত্রিপুরার শরণার্থ সমস্যা

আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য অন্যতম বড় বাধা ছিল ত্রিপুরার শরণার্থী প্রত্যাবাসন সমস্যা।

বি.এন.পি সরকারের আমলে শরণার্থী প্রত্যাবাসন সমস্যার কারণে জনসংহতি সমিতির সাথে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯২ সালের ২৬ মে তিন দিনব্যাপী ভারত সফর করেন। তাঁর ভারত সফরের প্রথম দিনে ২৬ মে তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত প্রধানত পানি বন্টন ও চাকমা শরণার্থী সমস্যা নিয়েই আলোচনা হয়। [২২]

তৎকালীন (বি.এন.পি) সরকারের আমলে বাণিজ্যমন্ত্রী এম. কে আনোয়ার ৪ আগস্ট ১৯৯২ তারিখে ভারত সফর করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। চাকমা শরণার্থী প্রসঙ্গে নরসীমা রাও তাকে বলেন যে, ভারত তার ভূ-খন্ডে একজনও শরণার্থী রাখতে চায় না। [২৩]

কিন্তু বাস্তবে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা হঠাৎ করে ১৩ দফা দাবি নিয়ে হাজির হন এবং ১৩ দফা দাবি পূরণ না হলে প্রত্যাবাসন বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেন। [২৪] ফলে বি.এন.পি সরকারের আমলে শরণার্থী প্রত্যাবাসন এবং জনসংহতি সমিতির সাথে কোন সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের দ্বিতীয় দফা আলোচনার পর ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা করতে। আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের প্রতিনিধিদল ত্রিপুরায়

Dhaka University Institutional Repository

গিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার সাথে আলোচনা করেন।

সরকারি প্রতিনিধি দল পরিবার পিছু ১৫ হাজার টাকা ও নয় মাসের রেশন দেবার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পরিবার পিছু ২০ হাজার টাকা এবং এক বৎসরের রেশন দাবি করেন। [২৫]

শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতাদের সাথে আলোচনা শেষে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্ সাংবাদিকদের বলেছিলেন চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে আমরা খুবই আশাবাদী। তবে তিনি বলেছিলেন শরণার্থীদের দাবি দাওয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট জানাবেন। [২৬]

দ্বিতীয় উদ্যোগ

শরণার্থী প্রত্যাবাসনের জন্য দ্বিতীয় বারের মতো ৬ মার্চ ৯৭ সালে ত্রিপুরায় যান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে। ত্রিপুরা পৌঁছেই আগরতলা সার্কিট হাউজে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। ৭ মার্চ পুনরায় শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ও ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারের সাথেও আলোচনা করেন। [২৭]

শরণার্থী প্রত্যাবাসন আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য দিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সি. এম. সফি শামি এবং কলকাতার ডেপুটি হাই কমিশনার জাহাঙ্গীর সাদাত যোগদান করেন। বাংলাদেশ শরণার্থীদের ফিরে আসার লক্ষ্যে বিশ দফা প্যাকেজ প্রস্তাব প্রদান করেন। [২৮]

বিশ দফা প্যাকেজ প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলো হলোঃ-

১। পরিবার প্রতি নগদ ১৫ হাজার টাকা।

২। চাষযোগ্য জমি থাকলে হালের গরু কেনার জন্য নগদ ১০ হাজার টাকা।

৩। দুধেল গাই কেনার জন্য নগদ তিন হাজার টাকা।

৪। পরিবার প্রতি দুই বান্ডিল টিন।

৫। নয় মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ২ কেজি ডাল ও তিন লিটার সয়াবিন তেল ও পাঁচ কেজি চাল।

৬। শরণার্থীদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা।

৭। ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ।

Dhaka University Institutional Repository

৮। অন্যান্য সরকারি ব্যাংক ঋণ যথাযথ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে মওকুফ ইত্যাদি। [২৯]

কিন্তু শরণার্থী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নিকট আরো সাত দফা সম্বলিত একটি স্মারক লিপি দেন। সাত দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ-

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে অর্থবহ আলোচনা এবং

২। জাতিসংঘ অথবা আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের তত্ত্বাবধানে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু এ-সব দাবি মানতে বাংলাদেশ এবং ভারত সরকার রাজি হয়নি। [৩০]

অনেক আলাপ আলোচনার পর ৯ মার্চ ৯৭ সালে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন যে ২৮ মার্চ থেকে শরণার্থীরা দেশে ফিরবে। [৩১]

অবশেষে ২৮ মার্চ ৯৭ সাল থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হয়। ২৮ মার্চ থেকে তিন দফায় ১০ দিনে মোট ১১শ পরিবারের ৬ হাজার ৩১৫জন সদস্য দেশে ফিরে। [৩২]

শরণার্থী জীবনের চাকরি ফেরত পেয়েছে ২১ জনের মধ্যে ১৪ জন। [৩৩] প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অক্ষয় মনি চাকমা এবং তার পরিবারের ৫ জন সদস্য রয়েছে। [৩৪]

এদিকে শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতারা সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না বলে নানা অভিযোগ করেন। সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হলে প্রত্যাবাসন বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেন।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ বি.এন.পি আমলে উপেন্দ্রলাল চাকমা হঠাৎ করে ১৩ দফা দাবি পেশের ফলে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ আমলে শান্তির পরিবেশ ফিরে এলেও হঠাৎ করে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়ে যায়। এই সম্পর্কে বিচিত্রার একটি সংখ্যায় সংবাদ শিরোনাম ছিল "অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ব্যাহত করার নতুন চক্রান্ত।" [৩৫]

সন্তু লারমা শরণার্থী সমস্যাকে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসাবে ধরার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং এক বৈঠকে বলেছিলেন "If you insists I can sign a agreement

Dhaka University Institutional Repository

risking my neck. But it will be no use. A peace agreement be effective unless the refugee in the Tripura camps returens." [৩৬]

উক্ত একই নিবন্ধে আরো লেখা হয়েছে যে The return of the refugee which has suddenly been halted are contingent upon the satisfaction of Upendra Lal Chakma a former M.P who enjoys the hospitality of the Indian authorities in Tripura and who presently operates from Delhi. [৩৭]

শরণার্থী সমস্যা তদারক করে থাকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের সম্মতির উপর শরণার্থী প্রত্যাবাসন নির্ভর করে। এই কথার সত্যতা পাওয়া যায় ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারের দেনিক জনকণ্ঠের সাথে এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যা ২২শে নভেম্বর ৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন "শরণার্থীরা যত শীঘ্র চলে যাবে এটা আমরাও চাই। এর চাপ দীর্ঘদিন বয়ে যাবার সঙ্গতি ইচ্ছা কোনটাই আমাদের নেই। আমরা মানবিক কারণেই তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি। ইতিমধ্যে শরণার্থী খাতে এক কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকারও তাদের ফিরিয়ে নিতে আন্তরিক।" [৩৮]

প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া কেন বার বার ব্যাহত হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন এটা আমারও প্রশ্ন। তিনি জানান শরণার্থী সমস্যা দেখাশুনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদেরকে এ বিষয়ে কথা বলতে বলেনি। [৩৯]

উক্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ছাড়া শরণার্থী প্রত্যাবাসন করা হয় না।

শরণার্থী সমস্যাকে জনসংহতি সমিতি তাদের দাবি আদায়ের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল তারা ভেবেছিল এই সমস্যা জিইয়ে রেখে যতটুকু দাবি আদায় করা যায় ততটাই তাদের সাফল্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় দফা আলোচনা

জনসংহতি সমিতির সাথে আওয়ামী লীগের তৃতীয় দফা আলোচনা হয় ১৯৯৭ সালের ১২ এবং ১৩ মার্চ। কোন যৌথ বিবৃতি ছাড়া জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের বৈঠক শেষ হলেও দুপক্ষই অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩০ এপ্রিল ৯৭ সাল পর্যন্ত বাড়ায়। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে জনসংহতি সমিতি দুটি দাবির ব্যাপারে অনড়। দাবি দুটি হচ্ছেঃ-

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুনর্বাসিত বাঙালিদের এবং বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের প্রত্যাহার।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার।

সরকার পক্ষ আঞ্চলিক পরিষদ এবং সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে শর্ত সাপেক্ষে রাজি হলেও পুনর্বাসিত বাঙালিদের প্রত্যাহার করার ব্যাপারে অমত প্রকাশ করেছে। [৪০]

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ মার্চ ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে এক সভায় ভাষণদান কালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পার্বত্য জেলা সমূহের স্থায়ী অ-উপজাতিয়দের অর্থাৎ পুনর্বাসিত বাঙালি যাতে করে বাস্তুভিটাচ্যুত না করা হয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দেন। [৪১]

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছিল জনসংহতি সমিতির নেতারা। এই নিয়ে সরকার এবং জনসংহতি সমিতির নেতাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। [৪২]

চতুর্থ দফা আলোচনা

সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির চতুর্থ দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১১ থেকে ১৪ মে ১৯৯৭ সালে। এই আলোচনা মূলত ভূমি ইস্যু নিয়েই অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবি নামা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, শরণার্থী পুনর্বাসন ইত্যাদি ইস্যুতে আলোচনা করা হয়। [৪৩] এ সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো একই ধরনের মত প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে জনসংহতি সমিতি অনড় অবস্থান গ্রহণ করে। জনসংহতি সমিতির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার জানিয়ে দেয় যে চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি প্রশ্নে বলা হয় প্রচলিত আইনেই পাহাড়িদের ভূমি ফেরত দেয়া হবে। দেশে ফিরে আসা শরণার্থীদের নিজ বসতভিটা ও জমিতে পুণর্বাসিত করা হবে। [৪৪]

চতুর্থ বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে আজকের কাগজের সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ।

"চতুর্থ বৈঠকে তারা বেশ নমনীয়। ভারত সরকারের চাপ ও পছন্দের রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন আওয়ামীল লীগ সরকারের আমলেই যতটুকু দাবি আদায় করা সম্ভব তা করে ফেলতে হবে এটা তারা বুঝে গেছে। তবে স্থায়ী শান্তি চুক্তির পর পরবর্তী সরকার যদি সে চুক্তি না মানে এ বিষয়ে তাদের সন্দেহ রয়েই গেছে। [৪৫]

শরণার্থী প্রত্যাবাসনে নতুন উদ্যোগ

চতুর্থ দফা আলোচনার পর শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতারা সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে অভিযোগ এনে শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ রাখেন।

উপজাতিয় শরণার্থীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম দেখতে দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও উপজাতিয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত ১৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল চারদিনের সফরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আসেন ২৯ মে ৯৭ সালে। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা প্রশাসক লোক রঞ্জন ও শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রঞ্জিত নারায়ণ চাকমা। [৪৬]

এর আগে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল ১৯ থেকে ২২ মে ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাথে শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা করতে। [৪৭]

ভারত এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির যে ১৪ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁরা ত্রিপুরার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ৫৭ পৃষ্ঠা রিপোর্টের মাধ্যমে আরো পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করে। দাবিগুলো হচ্ছে শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুর্নবাসনের জন্য UNHCR এবং ICRC এর অংশগ্রহণ এবং ১৯৯৪ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যাগত শরণার্থীদের বিশ দফা গুচ্ছ সুবিধা প্রদান, প্রত্যাগত শরণার্থীদের এক বছর বিনামূল্যে রেশন, শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে অর্থবহ আলোচনা। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে প্রত্যাগত শরণার্থীরা অনেকে তাদের বসতবাড়ি ফেরত পায়নি বলে জানানো হয়। [৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাস্কফোর্স গঠন

এদিকে উপজাতির শরণার্থীদের পুর্নবাসন বিষয়ে গঠন করা হয় ট্রাস্কফোর্স এবং এর চেয়ারম্যান করা হয় কল্পরঞ্জন চাকমাকে। প্রত্যাগত শরণার্থীদের জটিল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে গঠন করা হয় তিনটি স্পেশাল কমিটি। এই কমিটিগুলো প্রত্যাগত শরণার্থীদের জটিল সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। [৪৯]

শরণার্থী কল্যাণ সমিতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ দল ত্রিপুরায় যায় ২৮ জুলাই ৯৭ সালে। এর নেতৃত্ব দেন আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল জানায় ভূমি বিরোধ একটি জটিল ব্যাপার। যত শীঘ্র সম্ভব এ সমস্যার সমাধান করা হবে। শরণার্থী প্রত্যাবসনে ২০ দফার অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়েছে। বাকিগুলো সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান হবে। প্রতিনিধি দল ত্রিপুরার উদরপুর, আগরতলা ও সাট্রমে বৈঠক করেন। এতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একজন এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে দুইজন পদস্থ কর্মকর্তা যোগ দেন। [৫০]

কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

অবশেষে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের জন্য সরকারের শরণার্থী বিষয়ক ট্রাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা ৭ আগস্ট ত্রিপুরায় যান ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে। [৫১]

প্রতিনিধি দল ৮ আগস্ট ৯৭ সালে ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারসহ মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন। এদিকে শরণার্থী নেতারা নতুন করে তিনটি দাবি পেশ করেন। এগুলো হলোঃ—

১। ত্রিপুরা থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসনে UNHCR এর হস্তক্ষেপ।

২। শরণার্থী প্রত্যাবাসনে রেডক্রসের তত্ত্বাবধান।

৩। ৬০ এর দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে যেসব ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি শরণার্থী হিসাবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল পর্যায়ক্রমে তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। [৫২]

Dhaka University Institutional Repository

শরণার্থী নেতারা তাদের দাবি পূরণে এবং ২০ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর ৯৭ সাল পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছে, না হলে শরণার্থী প্রত্যাবাসন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। [৫৩]

শরণার্থী প্রত্যাবাসন শেষ উদ্যোগটিও ব্যর্থ হয়েছিল। এ সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো একই ধরনের মন্তব্য করেছে। ইত্তেফাক লিখেছে "সরকারি প্রতিনিধিদলের ত্রিপুরা সফর ব্যর্থ চাকমা শরণার্থী প্রশ্নে এখন উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" [৫৪]

The New Nation মন্তব্য করেছে-

Is the peace process being into a cul-de-soc? [৫৫]

প্রত্যাবাসন সফল না হবার জন্য জনসংহতি সমিতির নেতারা এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক বিচিত্রা লিখেছে "পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে শরণার্থী সমস্যাকে জনসংহতি সমিতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের উপর শান্তি চুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।" [৫৬]

তবে শরণার্থীরা যাতে ফেরত যায় সেজন্য ত্রিপুরার জনগণেরও রাজনৈতিক চাপ ছিল। কারণ শরণার্থী থাকার ফলে ত্রিপুরার জনগণের অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। [৫৭]

এমনকি ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী অনেক গোষ্ঠী যেমন ULFA, UNSF (United Nation Libaration Front), ATTF (All Tripura Tigers Front), AITF (All Tribal Front) গেরিলা সংগঠনগুলো চাচ্ছিল চাকমা শরণার্থীরা যাতে দেশে ফেরত যায় এবং ১৫ আগস্ট ৯৭ সালকে কেন্দ্র করে বিদেশী খেদাও আন্দোলন জোরদার করেছিল। [৫৮]

এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংবাদ বের হয়েছিল "ত্রিপুরার শরণার্থীদের বিরুদ্ধে সেভেন সিসটার গেরিলাদের আন্দোলনের ডাক।" [৫৯]

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও চাচ্ছিল চাকমা শরণার্থীরা যাতে বাংলাদেশে ফেরত যায়। কারণ বর্তমানে সকল চাকমাদের ঐক্যবদ্ধ করে চাকমাদের পৃথক আবাসভূমি গঠনের লক্ষ্যে ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের উদ্যোগ। ভারত মনে করে জনসংহতি সমিতির চাকমারা যদি ভারতীয় চাকমাদের সাথে যোগ দেয় তবে সমস্যা আরো এক্ট হবে। [৬০]

পঞ্চম দফা বৈঠক

শরণার্থী প্রত্যাবাসনে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির পঞ্চম দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৪ থেকে ১৮ জুলাই ৯৭ সালে। এই বৈঠকে জনসংহতি সমিতি ভূমি সম্পর্কে কয়েকটি নতুন দাবি উত্থাপন করে। যেমনঃ-

১। আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের সম্মতি ছাড়া কোন জমি পাহাড় কাউকে দেয়া যাবে না।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তি জমির মালিকানা গ্রহণ করলে তা বাতিল করা।

৩। ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাধা তুলে দেয়া এছাড়া এই বৈঠকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন UNHCR এর অধীনে করার জন্য দাবি তোলা হয়। [৬২]

এই বৈঠকে সন্তু লারমা ভবিষ্যতে কোন আলোচনায় ভারতকে অন্তর্ভূক্তির জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করেন। তিনি বলেন ভারতের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া তিনি স্বাধীনভাবে মতামত দিতে পারেন না। এই সম্পর্কে The New Nation লিখেছে "Source who were present in the last talks with in the PCJSS in Dhaka confirm that Shantu Larma categorically proposed the involvement of third party i.e. India in any further dialogue. Reportedly he felt and explained that it was difficult for him to negociate freely usless India who patronised the Shanti Bahini was involved directly. [৬৩]

এ বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ১৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি শরণার্থী সম্পর্কে ত্রিপুরা থেকে সরেজমিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেছেন এ রিপোর্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভুল তথ্যে ভরা। [৬৪]

ফলে পঞ্চম দফা আলোচনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিচিত্রা এ সম্পর্কে লিখেছে "জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের পঞ্চম বৈঠকে কোন মীমাংসা হয়নি।" [৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির আলোচনা ব্যর্থতা ও শরণার্থী প্রত্যাবাসনে অনিশ্চয়তার ফলে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এর পর ভারত জনসংহতি সমিতির উপর চাপ প্রয়োগ শুরু করে যাতে একটা মীমাংসায় পৌছানো হয়।

জনসংহতি সমিতি ও শরণার্থী কল্যাণ সমিতির উপর ভারতের চাপ

ভারত সরকার শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও জনসংহতি সমিতির উপর চাপ প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায় ত্রিপুরা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারের এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যা আজকের কাগজ ১৪ আগস্ট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেন ভারতে শান্তি বাহিনীর ক্যাম্প ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং উগ্রপন্থী সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীগুলোর তৎপরতা রোধে ৮শ কিলোমিটারেরও বেশি ত্রিপুরা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হচ্ছে। [৬৬]

ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক পৃথক সাক্ষাৎকারে আজকের কাগজকে বলেছেন "ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সে দেশের ভিতরে বাংলাদেশের উগ্রপন্থী সশস্ত্র ক্যাম্প ভেঙ্গে দিয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্য সরকার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শান্তি বাহিনীসহ কোন উগ্রপন্থী সংগঠনকে প্রশ্রয় দেবে না বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি বলেন বাংলাদেশ ভারতের খুবই বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্র। তাই ভবিষ্যতেও তথাকথিত শান্তি বাহিনীকে ভারত সরকার প্রশ্রয় দেবে না। [৬৭]

সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির পঞ্চম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১১-১৪ জুলাই ৯৭ এবং ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ৯৭। পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ বৈঠকের মাঝামাঝি এই সময়টা ছিল সমঝোতায় পৌছানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে সরকার ও শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাথে একটি সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব হয়েছিল ভারতের চাপের কারণে যার প্রেক্ষিতে একটা চুক্তি করা সম্ভব হয়েছিল।

ষষ্ঠ বৈঠক শুরুর আগে উপজাতিয় নেতাদের সাথে সরকারের কয়েকটি গোপন বৈঠক হয়েছিল যার সত্যতা মিলে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের ছাপা খবর থেকে।

দৈনিক ইনকিলাবের ১৪ আগস্ট ৯৭ সালে লিখেছে "কলকাতায় হাসনাত-উপেন্দ্রলাল চাকমার গোপন বৈঠক চুক্তি স্বাক্ষরের আশাবাদ।"

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির আজ আবার বৈঠকে বসছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে ঐ বৈঠকেই একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। তবে তা নিশ্চিত করে বলা হয়নি। বিভিন্ন সূত্রের পাওয়া খবরে জানা গেছে আজকের এই বৈঠকের জন্য ইতিমধ্যেই উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত গোপনে কয়েকদফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। চীপ হুইপ কয়েক দিন আগে অত্যন্ত গোপনে কলকাতা যান এবং সেখানে কয়েকজন বিদ্রোহী উপজাতি নেতার সাথে ব্যাপক আলোচনা করেন। তবে কলকাতা বৈঠকে তাঁদের কোন কোন বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি। কলকাতা বৈঠকের পরেই তাঁদেরকে দিল্লীতে তলব করা হয় এবং সেখান থেকে তাঁরা কোন ঘোষণা ছাড়াই ঢাকা চলে আসেন। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে শুক্রবার প্রায় দুঘন্টা ধরে আলোচনা করেন। ঐ বৈঠকে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্ উপস্থিত ছিলেন। তবে মনে করা হচ্ছে শান্তি বাহিনী ও সরকারের মধ্যে আজকের আলোচনায় একটা আপস রফায় পৌছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ৬৮

সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ২৬ অক্টোবর ৯৭ সালের সংখ্যায় একই ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিচিত্রায় প্রকাশিত রিপোর্টটি নিম্নরূপঃ— "জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার প্রাক্কালে হঠাৎ করে গত ১২ সেপ্টেম্বর শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা ঢাকা আসেন চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে। আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে উপেন্দ্রলাল চাকমা বাংলাদেশে আসেন। চীপ হুইপের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর শরণার্থী নেতারা বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার দেব মুখার্জীর সাথে আলোচনায় মিলিত হন।

১২ সেপ্টেম্বর দুপুর দুইটায় শরণার্থী প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এই সময়ে চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ছাড়া আর কেউ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। রুদ্ধদ্বার ঐ বৈঠকে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য গত মাসে কলকাতা সফরের সময় চীপ হুইপের সাথে উপেন্দ্রলাল চাকমার শরণার্থী বিষয়ে বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকের পর ভারত সরকার উপেন্দ্রলাল চাকমাকে দ্রুত শরণার্থী ফিরে যাবার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করেন। এর ফলে শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন বাবু প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন। শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতারা চলে যাবার পর দিন থেকে শুরু হয় শান্তি আলোচনা। শান্তি আলোচনাও নাটকীয়ভাবে এগিয়ে যায়। জনসংহতি সমিতি তাদের প্রস্তাবিত ৫ দফা থেকে কিছুটা দূরে সরে আসে। তাঁদের প্রস্তাবিত ৫ দফায় অটল থাকলে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হতো না। ৫ দফা মানতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হতো। [৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাকের ১৪ সেপ্টেম্বর ৯৭ সালের সংখ্যায় লিখেছে "গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার ফলপ্রসূ বৈঠক চুক্তি স্বাক্ষরের পথ প্রশস্ত করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। তাহাদের এই বৈঠকের পিছনে শান্তি বাহিনীর পরোক্ষ ইঙ্গিত রহিয়াছে। শরণার্থীদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে শান্তি বাহিনীর সহিত অর্থপূর্ণ আলোচনা হইলে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। শরণার্থীরা নতুন দাবি উথাপনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি কোন সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রত্যাবাসনের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর উপর ছাড়িয়া দেয়। প্রধানমন্ত্রীর সহিত বৈঠকের পর উপেন্দ্র লাল চাকমা জাতিসংঘ ও রেড ক্রস কমিটির তত্ত্বাবধানের দাবি হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে সম্মত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে ভারত সরকারের পরোক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তথা বাংলাদেশ সরকারের সহিত একটি সমঝোতায় আসার জন্য শান্তি বাহিনী ও শরণার্থী নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার দরুণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। [৭০]

দৈনিক সংবাদের ১৪ আগস্ট ৯৭ সালে একই ধরনের সংবাদ ছাপা হয়েছে।

The Daily Star ১৪ সেপ্টেম্বর ৯৭ সালের সংখ্যায় লিখেছে "A two member delegation of the refugee welfare association led by Upendra Lal Chakma had an unsecheduled meeting with the Prime Minister at her office on Friday. Details of the meeting were not availabe. But sources said that are helpful about a break through in the tommorow talks which they described as crucial for peace in the CHT. [৭১]

তবে মূলত ষষ্ঠ বৈঠকেই খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছিল। ষষ্ঠ বৈঠকে মূলত জটিল ভূমি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকাতে লেখা হয়েছে। ইত্তেফাক লিখেছে "ভূমি সমস্যাই চুক্তি স্বাক্ষরের প্রধান অন্তরায়।" [৭২]

তবে ষষ্ঠ বৈঠকে যেসব বিষয় নিয়ে খসড়া হয়েছিল সেগুলো হলোঃ—

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় গঠিত হবে।

২। জটিল ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। এর বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সংবিধান বহির্ভূত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৪। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং বাঙালি বহিষ্কার করা হবে না। [৭৩]

The Daily Star ১৮ সেপ্টেম্বর ৯৭ সালে লিখেছে "Signing in the next meet. Draft CHT prepared. [৭৪]

তবে জনসংহতি সমিতির কিছু দাবি দাওয়া ছিল যা তারা ভারতের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পূরণ করতে চেয়েছিল। এর সত্যতা মিলে The Daily Star এর ১৬ নভেম্বর ৯৭ সালের সংখ্যায়। ঐ পত্রিকাতে লেখা হয়েছেঃ—

To extent more pressure Mrinal Chakma and adviser of PCJSS who operate under the banner of Humanity protection forum in Agartola went public on B.B.C on Nov 10. He made as appeal to the Indian Prime minister Inder Gujral to take up the demand and winding up of strategic cantonment of Dighinala during his Gujral meeting with Bangladesh Prime-minister Sheikh Hasina at the three nation summit in Dhaka on Nov-23. [৭৫]

দৈনিক ইনকিলাবের ১২ নভেম্বর ৯৭ সালের সংখ্যায় একই ধরনের সংবাদ ছাপা হয়েছে। তাহলো- "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার আশু সমাধানে ভারতীয় হস্তক্ষেপের আবদার" বিদ্রোহী জনসংহতি সমিতির তরফে হিউম্যানিটি প্রোটেকশান ফোরাম ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমারের হস্তক্ষেপ দাবি করে যে চিঠি পাঠিয়েছে তাতে বলা হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের বর্তমান সুসম্পর্কের পটভূমিকায় মিঃ গুজরাল যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে অতি সত্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে জনসংহতি সমিতির দাবিগুলো আরো একবার ভাল করে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেন।

মিঃ মৃণাল কান্তি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সেই এলাকার ভোটার তালিকায় একমাত্র স্থানীয় উপজাতি এবং বহুদিন ধরে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাঙালিরা থাকেন সেটা খসড়া প্রস্তাবে সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান। [৭৬]

উপর্যুক্ত সংবাদগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতের রাজনৈতিক চাপ ও শান্তি বাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তারের কারণে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির একটি সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব হয়েছিল।

তাছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত The Statement পত্রিকাতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যার শিরোনাম ছিল "খসড়া চুক্তি ২৬শে নভেম্বর" আরো যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

তাহলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাকমা নেতাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তিনি অভিযোগ করেন যে বিরোধিদলগুলো তা বানচাল করতে চায়।[৭৭]

শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভারতের যে ভূমিকা ছিল তা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিমের এক জনসভার ভাষণের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়। বিগত ১৫ এপ্রিল ২০০১ সালে বরিশাল শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ভাষণদানকালে তিনি বলেছিলেন যে,

"একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে জেনারেল জিয়া এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। সে কারণে ভারতও শান্তি বাহিনীকে প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহযোগিতা করত। এই পরিস্থিতির কারণে খালেদা জিয়া তার যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদকে ভারতে পাঠিয়েও পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেননি।"

তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ ও ভারত আলাপ আলোচনা করে পরস্পর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য বন্ধ করতে রাজি হয়। তারপরই সন্তু লারমা শান্তি চুক্তির মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।"[৭৮]

শান্তি চুক্তি সম্পর্কে উপজাতিয় ছাত্রদের একটি সংগঠন "বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের" (পি.সি.পি) মনোভাবে পরিচয় পাওয়া যায় তাদের প্রকাশিত একটি পত্রিকার মাধ্যমে। "আমি বিদ্রোহী" নামক পত্রিকাতে সচেতন চাকমা লিখিত "অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ভূমিকা" শীর্ষক নিবন্ধে। তাতে বলা হয়েছে আওয়ামী লীগের সাথে জনসংহতি সমিতির গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই নিবন্ধে লেখা হয় যে "বস্তুত আত্মসমর্পণের অনেক আগে থেকে গোপন আঁতাত হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অধুনালুপ্ত শান্তি বাহিনীর গোপন আস্তানায় গিয়ে সন্তু লারমার সাথে দেখা করেন।[৭৯]

দৈনিক ইত্তেফাকের ১লা ডিসেম্বর ৯৭ সালে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর প্রাক্তন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী নেপথ্য থেকে এ যাবৎ শান্তি চুক্তিতে কাজ করিতেছেন। শেষ মুহূর্তে তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।[৭৯]

শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ভারতের যে নেপথ্য ভূমিকা রয়েছে সে ব্যাপারে বি.এন.পি স্থায়ী কমিটির সদস্য অলি আহমদ এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জেড. এ. খান মন্তব্য করেছিলেন যা ইতিপূর্বে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। শান্তি- অশান্তির দোলাচলে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাপ্তাহিক বিচিত্রা-২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ইং।

২। ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,পূর্বোক্ত।

৩। দৈনিক ইনকিলাব ১৫ আগস্ট ১৯৯৭।

৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা- ১৭ জানুয়ারী ১৯৯৭, অমীমাংসিত অন্যান্য সমস্যা সমাধানে হাসিনা-দেব-গৌড়ার আশাবাদ।

৫। ইত্তেফাক ৮ নভেম্বর ১৯৯৭।

৬। আজকের কাগজ ৪ মার্চ ১৯৯৭।

৭। আজকের কাগজ ৬ মার্চ ১৯৯৭।

৮। ভোরের কাগজ ৬ মার্চ ১৯৯৭।

৯। পূর্বোক্ত।

১০। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি, জুলাই-১৯৯১, পৃ-১৯০

১১। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, পূর্বোক্ত।

১২। জয়নাল আবেদীন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সরূপ সন্ধান, আমেনা বেগম, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ-১৯১।

১৩। আতিকুর রহমান, প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট, আতিকুর রহমান, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ- ১০-২০।

১৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৭- পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে চূড়ান্ত রূপরেখা ২৫ জানুয়ারী প্রদানের সম্ভাবনা

১৫। পূর্বোক্ত।

১৬। আজকের কাগজ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৭।

১৭। পূর্বোক্ত।

১৮। আজকের কাগজ ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৭।

১৯। বিচিত্রা- ২১ মার্চ ১৯৯৭- সরকার- জনসংহতি সমিতি, ৩০ এপ্রিল আবার বৈঠক।

২০। আজকের কাগজ ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৭।

২১। আজকের কাগজ ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৭।

২২। সংবাদ- ২৮ মে ১৯৯২।

400848

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

২৩। সংবাদ- ৫ আগস্ট ১৯৯২।

২৪। ইনকিলাব- ১৯ জানুয়ারী ১৯৯৩।

২৫। আজকের কাগজ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

২৬। আজকের কাগজ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

২৭। বিচিত্রা ১৪ মার্চ ১৯৯৭- উপজাতিয় শরণার্থী আসছে ঃ দু পক্ষের সমঝোতা।

২৮। আজকের কাগজ ৭ মার্চ ১৯৯৭।

২৯। জয়নাল আবেদীন, পূর্বোক্ত- পৃ: -২৬৩।

৩০। আজকের কাগজ ৬ মার্চ ১৯৯৭।

৩১। আজকের কাগজ ১০ মার্চ ১৯৯৭।

৩২। আজকের কাগজ ৬ এপ্রিল ১৯৯৭।

৩৩। আজকের কাগজ ২২ মে ১৯৯৭।

৩৪। আজকের কাগজ ২ এপ্রিল ১৯৯৭।

৩৫। বিচিত্রা- ৪ জুলাই ১৯৯৭। অনুকুল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ব্যাহত করার নুতন চক্রান্ত।

৩৬। Weekly Holiday- 25 July 1997. CHT Talk keep going in Circles.

৩৭। Ibid.

৩৮। জনকণ্ঠ ২২শে নভেম্বর ১৯৯৭।

৩৯। পূর্বোক্ত।

৪০। বিচিত্রা- ২১ মার্চ ১৯৯৭, সরকার জনসংহতি সমিতি ৩০ এপ্রিল আবার বৈঠক।

৪১। ইনকিলাব এবং আজকের কাগজ ১৩ মার্চ ১৯৯৭।

৪২। ইনকিলাব ১৪ মার্চ ১৯৯৭।

৪৩। আজকের কাগজ ১১ মে ১৯৯৭।

৪৪। আজকের কাগজ ১৩ মে ১৯৯৭।

৪৫। আজকের কাগজ ১৬ মে ১৯৯৭।

৪৬। আজকের কাগজ ৩১ মে ১৯৯৭।

৪৭। বিচিত্রা ৩০ মে ১৯৯৭, ত্রিপুরা থেকে পর্যবেক্ষক দল আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। বিচিত্রা ১১ জুলাই ১৯৯৭, শান্তি আলোচনা পিছিয়ে গেছে।

৪৯। বিচিত্রা ৪ জুলাই ১৯৯৭, অনুকুল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ব্যাহত করার নতুন চক্রান্ত।

৫০। আজকের কাগজ ২৩ জুলাই ১৯৯৭।

৫১। ইত্তেফাক ৭ আগস্ট ১৯৯৭।

৫২। আজকের কাগজ ৮ আগস্ট ১৯৯৭।

৫৩। আজকের কাগজ ১০ আগস্ট ১৯৯৭।

৫৪। আজকের কাগজ ১১ আগস্ট ১৯৯৭।

৫৫। The New Nation 24. Aug. 1997.

৫৬। বিচিত্রা- ১৫ আগস্ট ১৯৯৭, শরণার্থী প্রত্যাবাসন আলোচনা সফল হয়নি।

৫৭। ইত্তেফাক ২ নভেম্বর ১৯৯৬।

৫৮। সংগ্রাম ৯ আগস্ট ১৯৯৭।

৫৯। পূর্বোক্ত।

৬০। ইনকিলাব- ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৭।

৬১। বিচিত্রা- ২৫ জুলাই ১৯৯৭, জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের পঞ্চম বৈঠকে কোন মীমাংশা হয়নি।

৬২। আজকের কাগজ ১৬ জুলাই ১৯৯৭।

৬৩। The New Nation 24. Aug. 1997.

৬৪। বিচিত্রা ২৫ জুলাই ১৯৯৭, জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের পঞ্চম বৈঠকে কোন মীমাংশা হয়নি।

৬৫। পূর্বোক্ত।

৬৬। আজকের কাগজ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

৬৭। পূর্বোক্ত।

৬৮। ইনকিলাব ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

৬৯। ইত্তেফাক ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

৭০। The Daily Star- ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

৭১। ইত্তেফাক- ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

৭২। আজকের কাগজ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩। The Daily Star 18. Sept. 1997.

৭৪। The Daily Star 16. Nov. 1997.

৭৫। ইনকিলাব- ১২ নভেম্বর ১৯৯৭।

৭৬। The Statesman 20, Nov. 1997, Calcutta.

৭৭। প্রথম আলো ১৬ এপ্রিল ২০০০।

৭৮। আমি বিদ্রোহী- সচেতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ভূমিকা পৃ- ১২, ২০০০ইং।

৭৯। ইত্তেফাক ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার স্বার্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার স্বার্থ আলোচনা করার পূর্বে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে তার নীতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমেরিকার বৈদেশিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আমেরিকান স্বার্থ রক্ষা করা। দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকান স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে আমেরিকাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করতে দেখা যায়। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় যে নীতি অবলম্বন করতো, স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হবার পর তার নীতির অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় তার নীতিও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর এবং ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ থেকে চলে যাবার পর আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ দক্ষিণ এশিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে থাকে।[২] স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার বৈদেশিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিজম ঠেকানো। সে কারণে আমেরিকা দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানকে বেছে নিয়েছিল কমিউনিজমকে প্রতিহত করার জন্য। সে লক্ষ্যে পাকিস্তানকে প্রচুর অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করেছিল।[৩] এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিয়দের বিরাট দুঃখ দুর্দশার কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। অনেক উপজাতির জনগোষ্ঠী এই বাঁধ নির্মাণের ফলে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।[৪] এই সময়ে পাকিস্তান আমেরিকার মিত্রতার কারণে কোন প্রতিবাদ করেনি। এমনকি জিয়া এরশাদ আমলে সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা অভিযানকে আমেরিকা ভূ-কৌশলগত কারণে কোন প্রতিবাদ করেনি। সে সময়ে ভারতের বিরোধিতা করা ছিল আমেরিকার দক্ষিণ এশীয় নীতি।

স্নায়ুযুদ্ধের পর আমেরিকার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। S.P. Huntington এই সময়ে আমেরিকার বৈদেশিক নীতির তিনটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ

১। To maintain the U.S, as the premier global power which in the coming decade means countering the Japanise economic challanges.

Dhaka University Institutional Repository

2. To prevent the emergence of a political military Hegemonic power in Eurasia and

3. To protect concreate American interest in the Third World. [৫]

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদ্দেশ্যটা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য।

আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ

বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে আবির্ভূত হয়ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামরিক শক্তি সব দিক বিবেচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দক্ষিণ এশিয়ায় রাশিয়া কিংবা ভারতের চেয়ে চীনকে তার সম্ভাব্য প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মনে করছে এবং ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছে চীনকে মোকাবিলা করার জন্য। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ভারত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার থেকে দূরে রাখার জন্য গ্রহণ করেছে আপাত অখন্ড ভারত নীতি (United India Policy)। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক বজায় রাখছে ও প্রচুর বিনিয়োগ করছে। [৬]

অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাংক সহ অন্যান্য নানা সংস্থা ভারতকে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা করে চলছে। ভারত কর্তৃক কাশ্মীরে নৃশংস গণহত্যা ও ধংসযজ্ঞ কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন এবং বিতর্কিত TADA (Terrorist and Disruptive Prevention Act). আইন প্রবর্তন করলেও যুক্তরাষ্ট্র ও তার পাশ্চাত্য মিত্রবর্গ ও অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা নীরব ও অমনোযোগী। অন্যদিকে ভারতকে অখন্ড রাখতে এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রবণতা রোধ করতে যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও তার অন্যান্য সংস্থা বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগ করে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবর্গ।[৭] সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে।[৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রত্যাশিত শান্তি ফিরে আসেনি এই পাহাড়ি জনপদে। বরং শান্তি চুক্তি বিরোধি আরেকটি পাহাড়ি সংগঠন UPDF

Dhaka University Institutional Repository

(United People Democratic Front) এর জন্ম হয়েছে, যারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে এবং সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।[৯] ফলে চুক্তির স্বপক্ষে বিপক্ষে মতবাদধারীদের মধ্যে হানাহানি বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বলকানাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এ প্রক্রিয়াতেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে শুধুমাত্র খ্রিস্টান আধিক্যের অজুহাতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আগামী দু দশকের মধ্যে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও উখিয়াসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র আরো একটি স্বাধীন নতুন খ্রিস্টান কনফেডারেসী তৈরি করতে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচলের বেশির ভাগ উপজাতিয় জনসংখ্যাকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং বাদ বাকি আগামী ক'বছরেই খ্রিস্টান মিশনারী ও তাদের তৎপরতার মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার মতো টিমোরাইজেশন প্রক্রিয়ায় ধর্মান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও ঐ একই প্রক্রিয়া চলছে তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে।[১০] ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়ায় আমেরিকার সমর্থন দান করলে বিচিত্র কিছু হবে না।

আমেরিকার ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার বিশাল ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। আমেরিকা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে সব সময় সচেতন এবং পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। আমেরিকার তৈল ও গ্যাস কোম্পানীগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনিয়োগে আগ্রহী এবং এসব কোম্পানীগুলো চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থিতিশীল পরিবেশ।

আমেরিকার U.M.C (United Meritime [Bangladesh] Ltd.) কোম্পানীর সাথে বাংলাদেশ সরকার গ্যাস ও তৈল অনুসন্ধানের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বিগত ১২ মার্চ ১৯৯৭ সালে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় জ্বালানী মন্ত্রী লেঃ জেঃ (অবঃ) নুরুদ্দিন খান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল উপস্থিত ছিলেন। উৎপাদন ও বন্টন চুক্তি অনুযায়ী এই কোম্পানী কক্সবাজার, টেকনাফ ভূ-খন্ডের কিয়দংশ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা অর্থাৎ বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত দেশের সর্ববৃহৎ একরোজ ব্লক নং- ২২ এ পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান করবে। এ ব্লকের মোট আয়তন ১৩ হাজার ৩৯০ বর্গ

Dhaka University Institutional Repository

কিঃমিঃ। এ অনুসন্ধান সময়কাল হবে সাত বৎসর। অনুসন্ধান কাজ শেষ হবার পর কোম্পানী উৎপাদন এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে। অনুসন্ধান পর্বে U.M.C (Bangladesh) Ltd ৪টি অনুসন্ধান কূপ খনন করবে এবং এ বাবদ মোট ১২.৪০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে।[১১]

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মিঃ জেমস পি রুবিল Bangladesh: Agreement to and chittagong Hill Tracts Conflict শিরোনামে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনকে স্বাগত জানিয়েছে।[১২]

সেইজন্য আমেরিকা চায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাতে তদের বিনিয়োগ সুরক্ষিত থাকে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কেয়ার্ন এনার্জির ৯৪ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই কোম্পানী দেশের ১৫ ও ১৬ নং ব্লকে অনুসন্ধান কালে বঙ্গোপসাগরে দুটি গ্যাস কূপ আবিষ্কৃত হয়। আমেরিকার এসব তেল কোম্পানীগুলো খুবই প্রভাবশালী। তারা যে কোন সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। যদি কোন কারণে এসব তেল গ্যাস কোম্পানীর স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটে তবে তারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের সহায়তায় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।[১৩]

তাছাড়া লভ্যাংশের অংশীদারিত্বের বন্টনের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সরকারের, গ্যাস ক্ষেত্রে চাকুরি প্রদানের ব্যাপারে বাঙালিদের সাথে উপজাতিয়দের বিরোধ, গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও বিশেষজ্ঞদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অথবা পাইপ লাইনের নিরাপত্তার ব্যাপারেও বিরোধ দেখা দিতে পারে। এসব ব্যাপারগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।[১৪]

সম্প্রতিকালে আমেরিকান একটি কোম্পানীর সাথে চট্টগ্রাম বন্দরে একটি প্রাইভেট কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণের ব্যাপারে সরকার চুক্তি করতে যাচ্ছে। কিন্তু চট্টগ্রামের বন্দরশ্রমিক ইউনিয়নগুলো কোন বিদেশী কোম্পানীকে দিয়ে টার্মিনাল নির্মাণের বিরোধিতা করছে এবং নেপথ্যে ভারত তাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছে।[১৫] কারণ ভারত বঙ্গোপসাগরে কোন আমেরিকান নৌ-স্থাপনা নির্মাণের বিরোধি।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং তার সংলগ্ন এলাকায় আমেরিকার ভীষণ ধরনের ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মত একটি স্পর্শকাতর এলাকায় আমেরিকান কোম্পানীকে দিয়ে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান করানো কুফল ভবিষ্যতে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আফতাব আলম খান এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন "If you go for the foreign investment and multi national companies. There is very possibility Chittagong Hill Tracts and Bangladesh is going to be second Nigeria if not Indonesia আর যদি Properly use করা যায় তাহলে CHT and Bangladesh is going to be second Malaysia. [১৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১। Md. Abdul Hafiz. South Asia's Security Extra Regional Inputs BIISS Journal. Vol-10, No. 2. 1989, P-133.

২। Md. Nuruzzaman, National Security of Bangladesh, BIISS Journal. Vol-12, No.-3, 1991,P-

৩। Imtiaz Ahmed, Security Issue in South Asia- U.S. Relations, New conflict New begining BIISS Journal, Vol-21, No.-4, 2000, P-5

৪। Imtiaz Ahmed, Security issue in South Asia-US Relations. New conflict, New begining. BIISS Journal Vol-21. No-4, 2000, P-5

৫। S.P. Huntington, American Changing Strategic Interest, Survival Vol.33, No-1, IISS, Jan-Feb-1991, P-8.

৬। South Asia After the cold war. Sandy harden, Asain Survey, Vol-34, No-10, October-95, P-884

৭। ডঃ মোঃ আব্দুর রব, ৪ঠা মার্চ ২০০০, হোটেল সোনারগাঁয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে লিখিত বক্তব্য।

৮। The Daily Star, 5th Dec-1997, US welcome CHT Accord.

৯। Life is not Ouns Update-4, 2000, P-33.

১০। ডঃ মোঃ আব্দুর রব, পূর্বোক্ত।

১১। দৈনিক ইত্তেফাক ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭।

১২। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৪ মার্চ ১৯৯৭, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে নতুন চুক্তি।

১৩। A.B.M.A.G. Kibria Ex Inspector-General of Police. The CHT in security perspective weekly Holiday 20 and 27 Feb. 1998.

১৪। এ. বি. এম. এ. জি. কিবরিয়া, পূর্বোক্ত।

১৫। দৈনিক জনকণ্ঠ- ২৭জুন ২০০০।

১৬। ডঃ আফতাব আলম খান,
অধ্যাপক, ভূ-তত্ত্ব বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা সমাজে চেতনা সংখ্যা- ৫৯, জা-মার্চ ২০০০, পৃ-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বার্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও বিশাল স্বার্থ রয়েছে। European Union মানবাধিকার লংঘন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং তারা সব সময় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে চলছে মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য। বিগত ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রধান Ruth Albuquerque বাংলাদেশ সফর করেন। স্থানীয় একটি হোটেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন "The European Union is ready to support development project in The CHT but before that it wants to be sure that peace returns to the area. We are encouraged that a peace accord has been reached. Now we want to see how it is implemented. EU is ready to support with projects for development of the region but first we have to sure that peace is ensured. All conditions for implementations of the accord should be there.[১]

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে চলছে যাতে জটিল এবং স্পর্শকাতর সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান করা হয়। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এসব সমস্যাগুলো সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তার সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে কোন সহায়তা না দেবার জন্য। এসব বিষয়গুলো হলোঃ—

1. Operational of the Regional Council.

2. Restructuring of the three districts councils in the light of the peace accord.

3. Functioning of the land commission.

4. Code of conduct for NGO's working to EU also made it clear that there should be a code of conduct for NGO's working in the region and which sould be made operational before the EU will sanction funds for development.[২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাহ্ এ.এম.এস কিবরিয়া দাতাগোষ্ঠী দেশগুলোর সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ঐ সম্মেলনে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দাতা গোষ্ঠীর সাহায্য চান। দাতা গোষ্ঠীরাও পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য সাহায্য প্রদানে আগ্রহ দেখান। [৩]

বাংলাদেশ সরকার ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে দাতাগোষ্ঠীর নিকট (US $ 225) দুইশত মিলিয়ন ইউ এস ডলারের এক উন্নয়ন পরিকল্পনা উথাপন করেন। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় মূলত অবকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তারা যুক্তি দেখান যে এই পরিকল্পনা জনসংহতি সমিতি ও অন্যান্য জুম্ম সংগঠনের সাথে আলোচনা ও সম্মতি না করে প্রণয়ন করা হয়েছে। [৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং তারা বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে চলছে চুক্তির যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবচাইতে বড় বাধা হচ্ছে ভূমি সমস্যা। জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনে আগ্রহী। দাতাগোষ্ঠীগুলোও বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুর্নবাসন করতে চায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুর্নবাসনের লক্ষ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। [৫]

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে E.U এবং JSS এর মত এক এবং অভিন্ন তারা চায় বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালিদের অন্যত্র সরানোর ফলাফল ভবিষ্যতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিয়দের মধ্যে মতাদর্শগত অনেক বিরোধ এবং ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন রয়েছে। দাতাগোষ্ঠীগুলো কোন সংগঠনকে গুরুত্ব দেবে তা নিয়ে উপজাতিয়দের মধ্যে নতুন করে বিরোধ দেখা দিতে পারে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তিনটি জুম্ম সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত তিনজন সংসদ সদস্য, যারা আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ, তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং পাহাড়ি বাঙালি ভোটের দ্বারা নির্বাচিত।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতি যারা সাধারণ পাহাড়ি জনগণের সমর্থন পেয়ে আসছে এবং দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ বর্তমানে আঞ্চলিক পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে রেখেছে।

৩। UPDF (United People Democratic Front) যারা শান্তি চুক্তি বিরোধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনসহ পাহাড়ি জনগণের আলাদা সাংবিধানিক মর্যাদা লাভের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তারা ব্যাপক সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। [৬]

একটি গ্রুপের সাথে দাতাগোষ্ঠীর সুসম্পর্ক অন্য গোষ্ঠীগুলোকে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন করে তুলতে পারে। ১ অক্টোবর ২০০১ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি আসন দুইটি লাভ করেছে এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। বি.এন.পি, জামায়াতসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল শুরু থেকে শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। বি.এন.পি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন পুরো শান্তি চুক্তিটি রিভিউ করে বিতর্কিত বিষয়গুলো বাতিল করা হবে। [৭]

অপরদিকে সন্তু লারমা এক জনসভায় বলেছেন প্রয়োজনে আবার অস্ত্রহাতে নিয়ে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করবো। [৮]

দাতাগোষ্ঠীগুলো যদি জনসংহতি সমিতির দাবিগুলোকে সমর্থন করে এবং শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান বি.এন.পি সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার নতুন করে বিরোধ দেখা দিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। The Daily Star 19. December, 1997.

২। Life is not Ours. Update-4, Page-66, 2000.

৩। The Daily Star 5. December, 1997.

৪। Life is not ours, Update-4, P-66, 2000.

৬। Ibid- P-74.

৭। আজকের কাগজ ১৮ অক্টোবর ২০০১।

৮। ভোরের কাগজ ২৪ অক্টোবর ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের স্বার্থ রয়েছে। এসব সংগঠনগুলো মূলত দাতা গোষ্ঠীগুলোর মনোভাবকে সমর্থন করে থাকে। উপজাতিয়দের মানবাধিকার রক্ষা, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ রক্ষার নামে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে।

Chittagong Hill Tracts Commission এর প্রতিষ্ঠা

সত্তরের দশক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল। অনেক মানবাধিকার সংগঠন এবং এন.জি.ও তা বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছিল। এমনকি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তা বরাবরই অস্বীকার করে আসছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ১৯৮৫ সালের শেষের দিকে ডেনমার্কের পার্লামেন্টে ঘোষণা করে ছিলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেনি এবং যে কোন আন্তর্জাতিক স্বাধীন কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে সফর করতে পারবে। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাস্টারডামে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সম্মেলনে একটি রেজ্যুলেশন পাস হয়েছিল একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকারের বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখা হবে।

১৯৮৯ সালে দুইটি আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে Chittagong Hill Tracts Commission আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠন করা হয়েছিল। এই দুইটি সংস্থা হলো International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA) এবং Organising Committee on Chittagong Hill Tracts. [১]

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি দুদশকের সমস্যা। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় বিভিন্ন এন.জি.ও ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগ করে চলছিল এই সমস্যা সমাধানের জন্য। এই সব সংস্থাগুলো বিশেষত মানবাধিকার লংঘন, আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার নামে বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এইসব সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ—

Dhaka University Institutional Repository

১। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (U.K)

২। এ্যান্টি স্লেভারী ইন্টারন্যাশনাল (U.K)

৩। পার্লামেন্টারী হিউম্যান রাইটস (U.K)

৪। সারভাইবাল ইন্টারন্যাশনাল (U.K)

৫। দি অর্গানাইজিং কমিটি চিটাগং হিল ক্যাম্পেন (নেদারল্যান্ড)

৬। ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশীপ অরগানাইজেশন ফর রিকনসিলেশন (নেদারল্যান্ড)

৭। ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইনডিজিনিয়াস অ্যাফেয়ার্স (ডেনমার্ক)

৮। হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরাম (ইন্ডিয়া)

৯। সাউথ এশিয়া হিউম্যান রাইটস ডকুমেন্টেশান ফোরাম (ইন্ডিয়া)

১০। কমিশন ফর পিস এন্ড জাস্টিস (বাংলাদেশ)

১১। কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল ফর হিউম্যান ইন বাংলাদেশ (বাংলাদেশ)

১২। চিটাগং হিল কমিশন (নেদারল্যান্ড)[২]

এসব মানবাধিকার সংগঠনগুলোর উদ্যোগে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এসব সম্মেলনে তারা কতকগুলো সুপারিশ করেছিল এবং সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য। যেসব স্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো হলোঃ—

১। ১৯৮৬ সালে আমষ্টারডামে।

২। ১৯৮৭ সালে ভারতে।

৩। ১৯৮৯ সালে হামবুর্গে।

৪। ১৯৯২ সালে নিউইয়র্কে।

৫। ১৯৯৩ সালে নেদারল্যান্ডে।

৬। ১৯৯৭ সালে ব্যাংককে।[৩]

১৯৯৭ সালের ব্যাংকক সম্মেলন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির শান্তি আলোচনা চলছিল। এই সম্মেলনে তারা কতকগুলো সুপারিশ করেছিল। ১৯৯৭ সালের ২৩ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সম্মেলনে ২০টি দেশের কূটনৈতিক মিশনের পর্যবেক্ষক, এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, দুই আমেরিকা মহাদেশ, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি এবং ৪০টিরও বেশি সংগঠনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিসহ প্রায় ৭০জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা এবং সেখানকার জুম্ম (পাহাড়ী) জাতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে শান্তি আলোচনা এবং সমঝোতার পরিসর কি করে আরো বাড়ানো যায় সে বিষয়ে মত বিনিময় করেন। [৪]

ঐ সম্মেলনে স্থায়ী শান্তি ও সমঝোতার লক্ষ্যে কতকগুলো সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল। সেগুলো হলোঃ—

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের আগমন কার্যকারিভাবে বন্ধ করা, বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের স্থানান্তরিত করতে হবে, তাদের জন্য আর্থিক ক্ষতি পূরণ ও সহায়তার ব্যবস্থা করা।

২। ভূমির উপর জুম্ম জাতিগুলোর ঐতিহ্যগত অধিকার স্বীকার করে তাদের জমির অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা যা তাদের বেদখলকৃত জমি জুম্মদের হাতে ফিরিয়ে দেবে এবং এর উপর তাদের ভবিষ্যৎ অধিকারও নিশ্চিত করবে।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও স্থানীয় সম্পদের উপর জুম্ম জনগণের নিয়ন্ত্রণের ঐতিহ্যগত অধিকার স্বীকার ও তা রক্ষা করার।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের সময় নির্ধারণ করার।

৫। স্বতন্ত্র প্রশাসনিক এলাকা অনুমোদনের পর থাকবে স্বশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

৬। জাতিসংঘ সনদে উল্লেখিত নারীর অধিকারসহ মানবাধিকারের মর্যাদা রক্ষার ও নারীর বিরুদ্ধে সব বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের।

বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির প্রতি সুপারিশ মালা

১। একজন মধ্যস্থতাকারীকে আমন্ত্রণ জানানো যাতে করে তিনি বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি উভয়কে সংলাপে সহায়তা করতে পারেন এবং যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে তা নিরসনের উদ্যোগ নিতে পারেন।

২। পুনর্বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার, জনসংহতি সমিতি ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেটি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। ইতিমধ্যে ঘোষিত যুদ্ধবিরতি বাড়ানো।

৪। জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ এর ৩নং অনুচ্ছেদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সুপারিশ

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ইতিপূর্বে দেয়া স্বীকারোক্তি বাস্তবায়ন করা এবং এ লক্ষ্যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সুপারিশের পূর্ণ সহযোগিতা নেয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৎপর হওয়া।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যা চলমান শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে অবস্থা বৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত।

৩। বাঙালিদের গুচ্ছগ্রামগুলো ভেঙ্গে দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিসংঘের মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানানো যাতে করে তিনি অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিজে দেখতে পারেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যার জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রবেশ অবধারিত করা।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামে রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটিসহ সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রবেশ ও কাজের সুযোগ।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবৎ সংগঠিত মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তদন্ত করা। জুম্ম নারী ও পুরুষ সদস্যদের মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তদন্ত করা ও তা জন সমক্ষে প্রকাশ করা।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনকারীদের বেসামরিক আদালতে বিচার করা।

৮। ধর্মীয় নিপীড়ন ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে সাংবিধানিক গ্যারান্টি নিশ্চিত করা।

৯। আদিবাসী ও উপজাতিয় জনগোষ্ঠীর ওপর গৃহীত আই এলও কনভেনশন ১৬৯ এ স্বাক্ষর করা।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ

১। উল্লিখিত সুপারিশমালা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা।

২। বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসিত করার জন্যে বিশেষ অর্থ সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের উপর কাজ করছে যেসব সংস্থা তাদের সহায়তা দান।

৪। বাংলাদেশে পাঠানো খাদ্যসহ অন্যান্য সাহায্য খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই সামরিক বাহিনীর পেছনে ব্যয় না হয় সেটি নিশ্চিত ও অব্যহত পর্যবেক্ষণ করা।

ভারত সরকারের প্রতি অনুরোধ

১। ত্রিপুরার জুম্ম শরণার্থীদের আশ্রয় রেশন চিকিৎসা সুবিধা পানি, শিক্ষা, বিদ্যুৎ-জ্বালানীসহ অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা।

২। জুম্ম শরণার্থীদের চলাফেরা ও যোগাযোগের স্বাধীনতা দেয়াসহ তাদেরকে ক্যাম্প কমিটি করার অনুমতি ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা।

৩। জুম্ম শরণার্থীদের সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এন.জি.ও ও নারী সংস্থা, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ও রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটিকে কাজ করার অনুমতি।

৪। মাতৃ ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং ধর্ষণসহ অন্যান্য নিপীড়নের শিকার নারীদের জন্যে সব ধরনের পরামর্শ ও সহায়তা ব্যবস্থা করা।

৫। UNHCR ও I.C.R.C কে আমন্ত্রণ জানানো যাতে করে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের পর জুম্ম শরণার্থীদের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের সহায়তা করতে পারে।

উপর্যুক্ত সুপারিশমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাদের সুপারিশমালাগুলোর সাথে জনসংহতি সমিতির সংশোধিত পাঁচ দফা দাবির সাথে অনেক মিল রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে জনসংহতি সমিতি তাদের পাঁচ দফা দাবিনামা থেকে সরে আসলে সরকারের সাথে একটা চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষরের পরেও চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব মীমাংসা ও চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য Chittagong Hill Tracts Commission কতকগুলো সুপারিশমালা করেছিল।[৫]

Chittagong Hill Tracts Commission

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জুম্ম জনগণের প্রতি ও বাংলাদেশের জাতীয় এন.জি.ও দের প্রতি কতকগুলো আবেদন করেছিল।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন

CHT Commission আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ করে দাতাদেশ ও সংস্থার প্রতি কতকগুলো বিষয়ের উপর সুপারিশ করেছিল।

উন্নয়ন সম্বন্ধে তাদের সুপারিশসমূহঃ

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বন্ধ অথবা বিলম্ব করার সুপারিশ করেছিল যদি তা নিম্ন বর্ণিত শর্তাদি পূরণ না করেঃ—

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এবং শান্তির নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত।

১। উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি তা হলো তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের কাজ আরম্ভ করা।

২। ভূমি কমিশনের কাজ আরম্ভ করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা।

খ) যেসব জুম্ম পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধি এবং তা নস্যাত করতে চেয়েছিল এবং যাদেরকে ১৯৯৭ সালের চুক্তির পর গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। শুধুমাত্র সেই সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্য এবং সহযোগিতা করা যাবে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জুম্ম জনগণের সংগঠনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এমনকি শান্তি চুক্তিতে খুশি নয় এমন সংগঠনেরও সম্পৃক্ততা থাকলে চলবে এবং যে সমস্ত সংগঠন জুম্ম সাধারণ জনগণের কল্যাণে কাজ করছে তাদের সহায়তা করা।

৩। শুধুমাত্র জুম্ম জনগণ ও তাদের প্রকৃত সংগঠনকে সাহায্য করতে হবে যাতে কাজে তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। জুম্ম জনগণের উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ধ্যান ধারণা থাকতে হবে যাতে তাদের যথাযথ প্রকাশ ও প্রাধান্য পায় সেদিকে নজর দেয়া।

৪। জুম্ম জনগণকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। দাতাগোষ্ঠী ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা করার পূর্বে তাদের স্থানীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করতে হবে।

৫। বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে বনায়ন প্রকল্প প্রত্যাহার করা হয়।

৬। বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সাম্প্রতিককালে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচুর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। গ্যাস অনুসন্ধানের পূর্বে জুম্ম জনগণের সম্মতি নিতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের লভ্যাংশের অংশীদারিত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

মানবাধিকার সম্বন্ধে CHT কমিশনের সুপারিশসমূহ

সকল দাতা সরকার এবং সংস্থা যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সচেতন তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে যাতে বাংলাদেশ সরকার এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বন্ধ হয়। সেই জন্য CHT কমিশনের আবেদন—

১। সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। চুক্তির পূর্বে ও পরে যত মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে তার তদন্ত করা হয় এবং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। ভবিষ্যতে মানবাধিকার লংঘিত হলে তার জন্য তদন্ত বোর্ড গঠন ও বিচার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। দাতাগোষ্ঠীগুলোকে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন করার জন্য সমর্থন করতে হবে যেখানে ১৯৭০ সালের পর যেসব মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে তার বিচার হবে।

৩। জাতিসংঘকে অনুরোধ করতে হবে যাতে অর্থাৎ চট্টগ্রামের ইস্যু নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল গঠন করা হয়। যারা নিয়মিত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও মানবাধিকারের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবে।

৪। সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে UNHCR এবং ICRC কে অনুমতি দেয় শরণার্থী পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ তদারক করার জন্য।

৫। সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের জন্য পেশাগত চাকুরির ব্যবস্থা করেন।

ভূমি ইস্যু এবং বাঙালি উপস্থিতি সম্বন্ধে

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে এনে পুনর্বাসনের ফলে জুম্ম জনগণের সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। সামরিক এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষ CHT কমিশনের নিকট স্বীকার করেছে যে বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন মারাত্মক ভুল ছিল। জুম্ম জনগণ এই ব্যাপারে একমত যে সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করতে হবে। CHT কমিশন মনে করে যে বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করা সবচাইতে উত্তম সমাধান এবং সেই লক্ষ্যে তারা দাতাগোষ্ঠীগুলোকে কতকগুলো সুপারিশ প্রদান করেছে। যেমনঃ—

১। বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পূণর্বাসনের জন্য যে অর্থ দাতাগোষ্ঠী দেবে তা গ্রহণ করার জন্য। অনেক পুনর্বাসিত বাঙালি বিশেষ করে গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বাঙালিরা অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন চায়। CHT কমিশন দ্রুত বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনে বিশ্বাসী। অনেক পশ্চিমা দাতাদেশ বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনে আর্থিক সাহায্য করতে চায়। বাংলাদেশ সরকার যদি তাদের অনুরোধ করে তবে তারা বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা করতে রাজি রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২। একটি পুনর্বাসন কমিটি গঠন করতে হবে (এই কমিটিতে পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার কর্মী, সংসদ সদস্য, এন.জি.ও প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা থাকবে)। যারা সরকারকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করবে। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সাথে সাথে বহিরাগত বাঙালিদের পুনর্বাসন করতে হবে।

৩। বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে একটি International Land advisary Commission গঠন করা হয় যার কাজ হবে ভূমি কমিশনের জটিল কাজে সরকারকে সহায়তা করা। জুম্ম আইনজীবীদের এই কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে

CHT কমিশন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট কতগুলো আবেদন জানিয়েছিল। যেমনঃ—

১। বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হয়। শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় নতুন করে জাতিগত দাঙ্গা বাধতে পারে এবং এই দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

২। সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের দেয়া সরকারি প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়।

৩। শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন এবং জুম্ম জনগণকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন না দেয়া হলে এইসব বিষয়গুলো United Nations Human Rights Commission এবং United Nations Working Group on Indigenous People প্রভৃতি ফোরামে উত্থাপন করতে।

৪। বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে সাংবিধানিক গ্যারান্টির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদ নির্বাচন যাতে অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয় সেই জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

৬। JSS এবং UPDF এর উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন নাশকতামূলক কাজ না করে।

৭। JSS এবং UPDF এর মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য মধ্যস্থতা করতে হবে।

৮। জুম্ম জনগণের সাথে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে যাতে সময় সময় জুম্ম জনগণের তথ্য, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের অবস্থা পরিস্থিতি এবং দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

জুম্ম জনগণের প্রতি CHT Commission এর আবেদন

CHT কমিশন মনে করে অগণতান্ত্রিক উন্নয়ন পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি স্থাপন এবং সুশীল সমাজ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাই জুম্ম জনগণের প্রতি CHT কমিশনের আবেদনঃ—

১। JSS এবং UPDF তাদের সহযোগী সংগঠনকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংযত আচরণ করবে যাতে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ না বাধে। উভয় সংগঠনকে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতান্ত্রিক নীতিমালা বিশেষ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা মেনে চলবে।

২। দুটি গ্রুপকে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে হবে যাতে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করে দুটি গ্রুপের অস্তিত্ব টিকে থাকে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দুটি সংগঠন পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

৩। JSS তাদের প্রভাব সরকারের উপর প্রয়োগ করে UPDF এর যে সকল সদস্যকে সরকার আটক করেছিল তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে। CHT কমিশন মনে করে যে স্বাক্ষরকারী পক্ষ হিসাবে JSS এর এটা নৈতিক দায়িত্ব। CHT কমিশন মনে করে যে শান্তি প্রক্রিয়া তখনই সফল হবে যখন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা উভয় পক্ষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

CHT কমিশনের উপরোক্ত সুপারিশমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের সুপারিশমালার সাথে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ তথা UPDF এর পাঁচ দফা দাবিনামার অনেক মিল রয়েছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাঁচ দফা দাবিনামার মধ্যে রয়েছেঃ—

১। সাংবিধানিক গ্যারান্টির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে, বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে অন্যত্র সম্মানজনক পুনর্বাসন করতে হবে।

২। ভারত থেকে প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও স্ব স্ব জায়গা ফেরত দিতে হবে।

৩। সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে।

৪। এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে। UPDF ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।[৬]

ভবিষ্যতে UPDF এর দাবিনামা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো সমর্থন জানাতে পারে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১। Life is not Ours, Update-4, P-83, 2000.

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ, ভারত-১৯৯৬, পৃ-৮২।

৩। জয়নাল আবেদীন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সরূপ সন্ধান, আমেনা বেগম, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ- ১০৫।

৪। আজকের কাগজ ২৮শে নভেম্বর ১৯৯৭।
১৯৯৭সালের ২৩ থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ব্যাংকক সম্মেলনের সুপারিশগুলো আজকের কাগজ ২৮শে নভেম্বর ৯৭ সালের পত্রিকা থেকে উদ্বৃত করা হয়েছে।

৫। Life is not Ours, Update-4, P-78, 2000.

৬। আমি বিদ্রোহী, পি,সিপি'র আপোষহীণ সংগ্রামের এক যুগপূর্তি স্মরণিকা, পৃ-৬১, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর চীনের স্বার্থ

চীন এশিয়ার সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।[১] তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামরিক ক্ষমতা তাকে এই মনোভাব পোষণে উৎসাহিত করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর চীনের স্বার্থ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর চীনের স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে চীনের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এক সেমিনারে বলেছিলেন Chine is an exponent of panchashella of the doctrine of five principles if peaceful Co-existence.[২] But it has also been a weapons supplier to class war. Exponents and potential revolutionaries as well as to contentious parties in conflict at the some time it had been bent on demolishing the exiting frame of international power stracture and extablishing itself as an independent global center of power.[৩]

চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও প্রবৃদ্ধি বিস্ময়কর। সাম্প্রতিককালে চীনের রপ্তানি আয় জাপানকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আগস্ট ৯৪ সালে চীনের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪]

সাম্প্রতিককালে চীনের প্রতিরক্ষা ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। Chinis defence spending is increasing to give people libaration army the long term power projection capabilities. ১৯৯৫ সালে চীনের প্রতিরক্ষা ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে বহুল পরিমানে করা হয়েছে।[৫]

চীন হলো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক অস্ত্র মজুদকারী দেশ। চীনের ৮০ টিরও বেশি আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM) এবং ২০টিরও অধিক আন্তদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। চীনের ১৮০ টির অধিক পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপকারী বিমান রয়েছে।

চীনের নৌ-বাহিনীকেও আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। চীনের উদ্দেশ্য হলে একুশ শতাব্দীতে নৌ-বাহিনীকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় সবচাইতে শক্তিশালী নৌ-বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে চীনের নিকট বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার রাজনীতির পট পরিবর্তনের ফলে চীন বাংলাদেশ সম্পর্ক উঠা-নামা করে।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর চীনের উদ্দেশ্য হলো উপমহাদেশে ভারতের রাজনৈতিক সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য রোধ করা।[৭] সে কারণে চীন ১৯৬৫ সালে এবং ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। ১৯৭৫ সালে পট পরিবর্তনের পর চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

চীনের কৌশলগত সামরিক বিশারদদের নিকট দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশসমূহ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। চীন দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ গুলোকে ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারসাম্য আনার জন্য বিবেচনা করে থাকে।[৮]

সে কারণে চীন ভারতের আধিপত্য রোধ করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বার্মা ও নেপালকে সামরিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।[৯]

দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার রাজনীতির পট পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ যদি ভারতের প্রভাবাধীনে চলে যায় তবে চীন আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসাবে দেখা দিতে পারে। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন লেঃ জেনারেল এ.আই. করিম। তাঁর মতে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে যে দূরত্ব তাকে সামরিক ভাষাগত দিক থেকে Stone Throwing Distance হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যদি কোন সময় আঞ্চলিক রাজনীতি ও মতাদর্শ পরিবর্তিত হয় তবে চীনের অবস্থানকে আমরা হেলাফেলা করতে পারি না।[১০]

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের শুরুতে চীনের হাত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রেক্ষাপটে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল তখন চীন গোপনে তাদের সহায়তা করেছিল বলে অনেক গবেষক মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক নুরুল আমিন দেখিয়েছেন যে জনসংহতি সমিতি মূলত চীনা নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট ভাবধারার অনুসারী ছিল এবং জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা এক সময় চীনা পন্থী রাজনৈতিক দল ন্যাপ ভাষানীর অনুসারী ছিলেন।[১১]

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর The Future of Bangladesh নামক প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহে চীনের হাত ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১২]

তাছাড়া বিগত ২৯ জুলাই ১৯৯৭ সালে আজকের কাগজে দেয়া এক সাক্ষাৎকারেও তিনি একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন "শেখ মুজিবুর রহমান তাদের বলেছিলেন তোমরা নিজেদের মধ্যে গোলমাল করো না, যতটুকু দেবার আমি দেবো, তোমরা চুপচাপ থাকো। তখন আবার চীন তাদের সমর্থন করেছিল। যখন জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলেন তখন আবার ভারত তাদেরকে সমর্থন করা শুরু করলো।[১৩]

অধ্যাপক নুরুজ্জামান তার National Security of Bangladesh. Challenges and Options নামক প্রবন্ধে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিখ্যাত আরেকজন গবেষক মিজানুর রহমান শেলী তার The Chittagong Hill Tractos of Bangladesh : The Untold Story নামক গবেষণামূলক বইতেই শান্তি বাহিনীর উপর চীনাপন্থী কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব ছিল বলে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, "The Larma brothers M.N.Larma and J.B Larma (Shantu) having their indoctrination in communism early in their political carier, influenced PCJSS and SB with their indeological moorings, political lessons in communism are imparted to the cadres during their training. Among the captured documents from the members of SB who were killed or captured (by voluntery surrender or other wise) the common item is the Red Book of Mae Ze-dong. [১৪]

শান্তি বাহিনী গঠনের পশ্চাতে সে সময় এম.এন লার্মা ও অন্যান্য উপজাতিয় নেতৃত্বের মাঝে যে কয়টি দার্শনিক ভিত্তি কাজ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল যেহেতু তখনো চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি তাই হয়তো চীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে সহায়তা দানে এগিয়ে আসবে।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের পর থেকে ভারত শান্তি বাহিনীকে সব ধরনের সাহায্য দিয়ে আসছে। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় শান্তি চুক্তি। প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিতে চাকমারা বেশি লাভবান হয়েছে এবং তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বড় বড় পদ দখল করে নিয়েছে। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অন্যান্য উপজাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বান্দরবানের মারামারা গঠন করেছে ম্রু (Mru) বাহিনী এবং তারা আলাদা মারমা রাষ্ট্র গঠন করার উদ্যোগ নিচ্ছে।[১৬]

বিগত ৩ মে ১৯৯৭ সালে বান্দরবান বি.ডি.আর ক্যাম্পে একদল বিদ্রোহী সশস্ত্র হামলা চালায় এবং চার ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধ হয়। এতে একজন বি.ডি.আর সদস্য ও দুইজন বিদ্রোহী নিহত হয়। পরে দুইজন বিদ্রোহীকে নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা জানায় থানছি আক্রমণের পূর্বে ২৮ এপ্রিল ক্রাই ক্ষ্যাং পাড়ায় বান্দরবান জেলাতে এক সভা হয়। উক্ত সভায় বান্দরবান জেলার সকল হেডম্যানদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়। তারা আরো জানায় সন্তু লারমার দল রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে স্বায়ত্বশাসন দাবি করছে আমরা মারমারা বান্দরবানে বোমাং সার্কেলে মারমা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো। তারা স্বীকার করেছে যে তাদের সাথে বার্মার আরাকান লিবারেশন পার্টির বিদ্রোহী গ্রুপের যোগাযোগ রয়েছে।[১৭]

তাছাড়া বিগত ২৯ জুন ২০০১ দৈনিক সংগ্রামে একটি খবর বের হয়েছে। সেটা হলো বান্দরবান থেকে অত্যাধুনিক চাইনিজ ওয়ারল্যাস সেটসহ একজন উপজাতিয় চাকমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[১৮]

এসব খবর ছোট হলেও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপুর্ণ।

মারমাদের সাথে চাকমাদের বিরোধ অনেক দিনের। বান্দরবান জেলাতে মারমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। চাকমাদের সাথে তাদের অনেক স্বার্থগত বিরোধ রয়েছে। আশির দশকে মারমারা শান্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারলো শান্তি বাহিনীর দাবি দাওয়া সবই চাকমাদের স্বার্থে তখন তারা শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ করা শুরু করলো এবং অনেক জায়গায় শান্তি বাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল।[১৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের বেশি সুযোগ সুবিধা দেয়া হলে মারমারা এক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহ করতে পারে এবং আঞ্চলিক রাজনীতি পরিবর্তনের ফলে যদি চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয় তবে চীন বার্মার মাধ্যমে মারমাদের বিদ্রোহে উৎসাহ দিতে পারে। কারণ বার্মার সাথে চীনের

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক সম্পর্ক খুবই দৃঢ়।[২০] তদুপরি রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশ, চীনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করেছিল। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে চীনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

বিগত ২২ অক্টোবর ১৯৯৮ সালে সন্তু লারমাকে দেয়া বান্দরবানে এক সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন এক উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আভাস পাচ্ছি।[২১]

চীনের ভূ-কৌশলগত স্বার্থ

এশিয়ার প্রধানশক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে চীন ভারত মহাসাগরের নীল জলভাগের সরাসরি প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত। ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করতে হলে মায়ানমারের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ইউনান প্রদেশ থেকে যাত্রা করে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পরবর্তীতে পশ্চিম হয়ে প্রায় ৯০০ কিঃমিঃ অত্যন্ত দুর্গম এবং বনাবৃত জনবিরল মায়ানমার ও ভারতীয় (উঃ পূঃ) ভূ-ভাগ অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে হবে এবং এখান থেকে সহজেই ৫০-৬০ কিঃ মিঃ দূরে চট্টগ্রাম বন্দর বা দক্ষিণে আরো কম দূরত্বে বঙ্গোপসাগরের কূলে পৌঁছতে পারবে। এ ক্ষেত্রে মায়ানমার ভারত এবং বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিয় মঙ্গোলীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক স্বগোত্রীয় চীনাদের সহজেই বরণ করে নিতে পারে। উল্লেখ্য এ অঞ্চলের উপজাতিয়রা ব্রিটিশ ভারতের ১৮২৬ সালের চুক্তিবলে সৃষ্ট ভারত-বাংলাদেশ-বার্মার কৃত্রিম রাজনৈতিক সীমানাকে কখনো স্বীকার করেনি।[২২] চীন এখনও ভারত-চীন সীমানা চিহ্নিত রেখা ম্যাকমোহন লাইনকে স্বীকার করেনি।[২৩] মায়ানমারের উত্তরাংশের চীন আরাকানী চাকমা মারমা ভারতের মিজো ইত্যাদি জনগোষ্ঠী মূলত একই নৃভাত্ত্বিক ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মায়ানমারের ঐ অঞ্চলের কারেন, কাচিন, শান জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর গেরিলা তৎপর রয়েছে। নাগা মনিপুরী এবং আসামী সকল গেরিলাদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বাহিনীর একটি বড় অংশের যোগাযোগ রয়েছে। জানা গেছে ভারতের উত্তর-পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মায়ানমারের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশ নিয়ে স্বাধীন মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীসমূহ একটি বৃহৎ কনফেডারেসী ধরনের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চায়। ঐ ভাবী রূপকাররা সমুদ্র সংযোগ পথের প্রয়োজনে চট্টগ্রামের উপকূল রেখার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। বাস্তব ভূ-রাজনৈতিক তাগিদে দূরবর্তী চীন ঐ সকল কমিউনিস্ট এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোকে একত্রিত, সংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত করে এদের তৎপরতার মাধ্যমে স্বীয় আধিপত্য চালিয়ে যেতে পারে।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১। Lt. Colnel Aminul Karim, Power Politics in The Indian Ocean Region After the cold war. BIISS Journal, Vol.-16, No.-4, 1995, P-521.

২। Prof. Abul Kalam, Chines Foreign Policy and Security perceptions, BIISS Journal Vol-17, No-2, 1996, P-172

৩। Prof. Abul Kalam, Ibid—172

৪। C.V. Ranganathan, China The Asian Miracle and India-china relations, India Defence Review, Lancer Publications, New Delhi, Oct-December, 1994, P-10

৫। Lt. Colnel Aminul Karim, Power Politics in the Indian Ocean Region after the cold war, BIISS Journal- Vol-16, No-4, 1995, P-522.

৬। Lt. Colnel Aminul Karim, Ibid-523.

৭। Nilufar Chowdhury. Sino-India Guest For Rapprochment Implication for south Asia- BIISS Paper No-9, 1989, P-14.

৮। Ibid-P-15.

৯। Lt. Colnel Aminul Karim- Ibid-P-525.

১০। Lt. General A.I. Karim, Security of Small States, Security of Small States in the south Asian context প্রবন্ধ।

১১। Md. Nurl Amin- Secessionist Movement in the CHT. Vol-7, No-2, Islamabad 1988/89, P-141.

১২। Talukder Maniruzzaman. "The Future of Bangladesh" in a Jayaratnan Wilson and Denis Dalton (eds), The States of South Asia, Problem of National Integration. 1982 New Delhi, P-270.

১৩। আজকের কাগজ ২৯ জুলাই ১৯৯৭,

Dhaka University Institutional Repository

১৪। Md. Mizanur Rahman Shelly. The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, The Untold story, Center for Development Research, Dhaka-1992, P-111.

১৫। প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিদ্ধার্থ চাকমা, নর্থ ব্রাদার্স কলকাতা-১৯৮৬, পৃ-১০৩-১০৫।

১৬। Chittagong Hill Tracts Commission life is not ours. Update-4. 2000, P-31.

১৭। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৩ মে ১৯৯৭।

১৮। দৈনিক সংগ্রাম ২৯ জুন-২০০১।

১৯। CHT Commission life is not ours, Update-4, 2000. P-38.

২০। Abu Taher Salahuddin Ahmed. Myanmar, Politics Economy and Foreign Relations, BIISS Journal, Vol-18, No-2, 1997, P-140.

২১। দৈনিক জনকণ্ঠ ৭ নভেম্বর ১৯৯৮।

২২। ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও রাজনীতি, আহা পর্বত আহা চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ-১৩০।

২৩। Nilufar Chowdhury, Ibid-P-9.

২৪। ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, পূর্বোক্ত- পৃ-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মায়ানমারের স্বার্থ

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দুইটি প্রতিবেশী দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাংলাদেশের তিনদিক অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিম দিক দিয়ে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বাংলাদেশের দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের প্রায় ১৭০ কিঃ মিঃ সীমান্ত রেখা বিদ্যমান। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিয় জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ অংশই মাত্র কয়েক দশক আগে মায়ানমার থেকে জনস্থানান্তরিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিয়দের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার আচরণের সাথে মায়ানমারের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশে বসবাসকারী উপজাতিয়দের যথেষ্ট মিল রয়েছে।[১]

মায়ানমারের ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অর্থাৎ শান কোচিন ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। ফলে মায়ানমারের ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও মায়ানমারের বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা দুটি বহিঃ উপাদানকে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। দুটিরই সুত্রপাত দুই প্রতিবেশী দেশ অর্থাৎ ভারত এবং বার্মা থেকে।[২]

রোহিঙ্গা সমস্যা, ১৯৯১ সালে সীমান্ত ফাঁড়ি আক্রমণ এবং ২০০০ সালে সীমান্ত সংঘর্ষ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মায়ানমার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতিকে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করেছিল এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে মায়ানমারের ভূ-খন্ডকে বিভিন্ন সময় শান্তি বাহিনিকে মদদ দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ-

১। ১৯৮৩ সাল প্রীতি কুমার চাকমা গ্রুপ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিরুদ্ধে কতকগুলো অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। এর মধ্যে অন্যতম একটি অভিযোগ হলো, ১৯৭৪ সালে রাঁা ত্রিদি রায় যখন বার্মাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন সান্টু লারমা তার নিকট প্রায় এক লাখ টাকা পায় পাকিস্তানি সাহায্য হিসেবে। কিন্তু প্রীতি কুমারের লোকজন শান্তি বাহিনীর কর্মীদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে সান্টু লারমা সে টাকা আত্মসাৎ করে নিজেদের পারিবারিক কাজে ব্যয় করেছে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

২। বিগত ৩ মে ১৯৯৭ সালে বান্দরবানের থানছি বি.ডি.আর ক্যাম্পে একদল বিদ্রোহী সশস্ত্র হামলা চালায় এবং চার ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধ হয়। এতে একজন বি.ডি.আর সদস্য ও দুইজন বিদ্রোহী নিহত হয়। পরে দুইজন বিদ্রোহীকে নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেফতার করেছিল। গ্রেফতারকৃতরা জানায় থানছি আক্রমণের পূর্বে ২৮ এপ্রিল ভাই ক্যাং পাড়ায় বান্দরবান জেলাতে এক সভা হয়। উক্ত সভায় বান্দরবান জেলার সকল হেডম্যানকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। তারা আরো জানায় সন্ত লারমার দল রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাতে স্বায়ত্বশাসন দাবি করছে। আমরা মারমারা বান্দরবানে রোমাং সার্কেলে মারমা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। তারা স্বীকার করেছে যে তাদের সাথে বার্মার আরাকান লিবারেশন পার্টির বিদ্রোহী গ্রুপের যোগাযোগ রয়েছে।[৪]

উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে মায়ানমারের বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করতে সহায়তা করতে পারে।

মায়ানমারের অনেকগুলো বিদ্রোহী গ্রুপ রয়েছে। যেমন- R.S.O. (Rahinga Solidarity Organization, A.S.O. Arakan Solidarity Organization A.R.N.O. (Arakan Rahinga Organization) ARIF নামে কয়েকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় গভীর অরণ্যে ঘাটি রয়েছে।[৫] অভিযোগ রয়েছে যে পাইকারী ঘনধুম বাইশকাড়ি দোদড়ি এলাকায় সীমান্ত সংলগ্ন গহীন অরণ্যে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ঘাঁটি রয়েছে। তাদের সাথে স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগাযোগ রয়েছে।[৬] এসব গ্রুপগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলতে পারে।

জনসংহতি সমিতিও তাদের তৎপরতার বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

১। ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি, আদিযা প্রকাশনী, ঢাকা- ১৯৯৯, পৃ-১২৭।

২। অধ্যাপক আবুল কালাম। বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঃ তাত্ত্বিক দিক ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত, নিবন্ধমালা- দশম খন্ড মার্চ-২০০০ উচ্চতর মাববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-১২৫।

৩। সাপ্তাহিক রোববার, প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭

৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা- ২৩শে মে ১৯৯৭

৫। প্রথম আলো ৪ জুন ২০০১ সাল

৬। প্রথম আলো, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, উপজাতিয়দের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন বহিঃশক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতিয় বিদ্রোহে সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়ে ছিল। বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতির কারণে এই সমস্যাটি আরো বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর উপজাতিয় সমস্যাটি আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠে। এই প্রক্রিয়া ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। সে কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলির উপর নজর রাখতে হচ্ছে। বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং উপজাতিয়দের মধ্যে শান্তি চুক্তির পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে উপজাতিয়দের মধ্যে আরেকটি নতুন সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। তাছাড়া চীন এবং মায়ানমারের ভূকৌশলগত স্বার্থ রয়েছে এই এলাকাটিকে ঘিরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে।

এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা প্রাপ্তি সমুহ নিম্নে আলোচিত হলোঃ-

প্রথম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা ভারত বিভক্তির সময় থেকে মূলত উদ্ভব হয়েছিল। তবে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে এই সমস্যা সূচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনেরর পর থেকে এই সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করেছিল। যেসব উপাদান উপজাতিয় সমস্যা উদ্ভবে প্রভাবিত করেছিল সেগুলো হলোঃ

উপজাতিয় সমস্যা উদ্ভবে কতকগুলো উপাদান কাজ করেছে।

ক) কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতিয়রা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পায়নি।

খ) বাঙালিদের অর্থনৈতিক শোষণ

গ) শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপজাতিয়দের চারদফা দাবিনামা সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

ঘ) জিয়াউর রহমান উপজাতিয় সমস্যা সমাধানের জন্য সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার ফলে এই সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করেছিল।

জনসংখ্যার সারণী থেকে দেখা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক বাঙালি উপজাতিয়দের মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রভাবশালী এবং শিক্ষাদীক্ষায় অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে অগ্রসর। ফলে উপজাতিয় কোটায় বেশির ভাগ সুযোগ সুবিধা তারাই ভোগ করছে। পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা নীতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহতি পরে শেখ মুজিবের আমলে এই সমস্যাটি মাথাচাড়া দিলে, শেখ মুজিব পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বাধিক সংখ্যক সেনা মোতায়েন করেছিল এবং দীঘিনালা আলী কদম ও রুমায় সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছিল। কাপ্তাইতে নেভাল বেস শেখ মুজিবের আমলেই স্থাপিত হয়েছিল। শেখ মুজিবের শাসনামলে অর্থাৎ ১৯৭১-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি মাথাচাড়া দেয় নাই। কারন সে সময়ে ভারতের সাথে আমাদের সুসম্পর্কের কারণে ভারত শান্তি বাহিনীকে কোন সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে নাই। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করে। ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছিল। ভারত এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়কে বিশিষ্ট গবেষক মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবারাহীম একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে ভারত শান্তি বাহিনীকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছিল। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে, ১৯৭৭ সালের আগস্ট ১৯৭১ সালের জুলাই এবং ১৯৮৯ সালে বড় ধরনের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। জিয়া এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার শাসনামলে (১৯৯১-১৯৯৬) পর্যন্ত বাংলাদেশের নিরাপত্তা নীতি ছিল চীনা নির্ভর। সে কারণে ভারতের সদিচ্ছার অভাবে শান্তি বাহিনীর সাথে কোন সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ১১ ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে ঘোষণা করেছিলেন যে বাংলাদেশের মাটিকে সন্ত্রাসী তৎপরতার ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। তাঁর এই ঘোষণার পর থেকে নিরাপত্তানীতির ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে (১৯০৬-২০০১) বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। (১৯৯৬-২০০১) আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ULFA নেতা অনুপ চেটিয়া অন্যতম। নিরাপত্তা নীতির এই পরিবর্তনের ফলে জনসংহতি সমিতির সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন সহজতর হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি বিদ্রোহে বহিঃশক্তির ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের ভূমিকার কথা স্বভাবতই এসেছে। কারণ ভারত হলো দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থ রাষ্ট্র এবং ভারতকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার রাজনীতি বিবর্তিত হয়। তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভে ভারতের নিরাপত্তা নীতি আলোচিত হয়েছে। ভারতের নিরাপত্তা নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক অভিমত ব্যক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন যে ভারত চায় দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশগুলোর উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে। ভারতে আয়তন জনসংখ্যা, কৌশলগত অবস্থান, জাতীয় সম্পদ এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্য তাকে এই মনোভাব পোষণ করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। ভারত নিজেকে আমেরিকা রাশিয়া ও চীনের সমকক্ষ শক্তি হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সে কারণে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় কোন বিদেশী শক্তির উপস্থিতি মেনে নিতে চায় না। ভারত দক্ষিণ এশিয়াকে একটি একক কৌশলগত ইউনিট হিসেবে মনে করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশগুলোর নিরাপত্তা তার নিজের নিরাপত্তা হিসেবে মনে করে। ভারতের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ ভারতের আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি হুমকি হিসেবে মনে করে। ১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধের সময় ভারতের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান আমলে ভারতের নাগা মিজো বিদ্রোহীরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সমর্থন দান এটাও একটা অন্যতম কারণ। যে কারণে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পরেই অপারেশন ঈগল নামক এক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে নাগামিজো বিদ্রোহীদের দমন করা হয়। ভারত সব সময় চিন্তিত থাকে যে, বাংলাদেশ যদি ভারত বিরোধি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে ভারতের জন্য সবচাইতে বিপদজনক এলাকা। ভারত চায় চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করতে, এর জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে ভারত চাবি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। ১৯৭৫ সালের পর ভারত মিজো বিদ্রোহীদের মধ্যে চাকমা অনুপ্রবেশ করিয়ে অনেক সুবিধা আদায় করেছিল।

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে ভারত শান্তি বাহিনীকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে আসছিল। শান্তি বাহিনীর বিদ্রোহীদের পিছনে ভারত প্রচুর অর্থব্যয় করেছিল। এমনিক আন্তর্জাতিক ফোরামে শান্তিবাহিনীর পক্ষে প্রচারণা চালাতো ভারত। তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। ভারত এবং বাংলাদেশের অনেক গবেষক, চাকমা বিদ্রোহী নেতা এবং সামরিক গোয়েন্দা প্রধানদের বক্তব্য থেকেও শান্তি বাহিনীর সমর্থনে ভারতের নাম সর্বাগ্রে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই.জে. গুজরালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে লন্ডনে এক একাডেমিক ভাষনের মাধ্যমে। তাছাড়া ত্রিপুরার সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও ভারতে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে গিয়ে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট গবেষক ও সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ভারতের সাতটি ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত করার ব্যাপারে ভারতের বিশাল ভূমিকা ছিল। ভারতের আন্তরিক সদিচ্ছা ছাড়া একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। ভারত জনসংহতি সমিতি এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির উপর চাপ প্রয়োগ করে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে সাহায্য করেছিল। সে কারণে জনসংহতি সমিতি তাদের প্রস্তাবিত পাঁচ দফা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির কয়েকদফা এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির কয়েক দফা আলোচনার ভিত্তিতে ত্রিপুরা থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির কয়েকদফা এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির কয়েক দফা আলোচনার ভিত্তিতে ত্রিপুরা থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে আমেরিকার সূদুর প্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। আমেরিকার তেল গ্যাস কোম্পানীগুলোর স্বার্থ রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে। আমেরিকার একটি বহুজাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানী U.M.C (Bangladesh) Ltd. এবং কেয়ান এনার্জি পার্বত্য চট্টগ্রাম এবংতৎসংলগ্ন এলাকাকে ঘিরে বিশাল ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। এসব বহুজাতিক কোম্পানীগুলো স্বার্থের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ঘোলাটে আকার ধারণ করতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন E.U. মানবাধিকার লংঘন, আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারে উপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন E.U. বাংলাদেশ সরকারের উপর চারটি বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থায়নের বিরোধিতা করছে।

ক) আঞ্চলিক পরিষদের কার্যক্রম শুরু

খ)শান্তি চুক্তির আলোকে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রম শুরু

গ) ভূমি কমিশনের কাজ শুরু

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামে N.G.O. দের কার্যক্রম পরিচালন জন্য আচরনবিধি প্রণয়ন-

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সরকারের দেয়া ২২৫ কোটি মার্কিন ডলারের এক উন্নয়ন পরিকল্পনা E.U. গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এই বলে যে তাতে জনসংহতি সমিতি এবং অন্যান্য জুম্ম সংগঠনের সম্পৃক্ততা ছিল না। E.U. পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালি যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যেতে আগ্রহী তাদেরকে সমতলভূমিতে পুনর্বাসনে এবং এ ব্যাপারে তারা সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে আগ্রহী। শান্তি চুক্তি এবং তার বাস্তবায়ন এবং চুক্তির বিরোধিতা নিয়ে উপজাতিয়দের দুটি সংগঠনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। একটি J.S.S এবং অপরটি U.P.D.F (United poples democratic Front) একটি গ্রুপের সাথে দাতা গোষ্ঠীর সুসম্পর্ক অন্য গ্রুপকে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন করে তুলতে পারে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন সত্তর দশক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট সচেতন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লংঘন, আদিবাসীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য ১২টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও N.G.O. কাজ করছে। ১৯৯৭ সালে থাইল্যান্ডের রাজধানি ব্যাংককে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ঐ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতকগুলো সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার, জনসংহতি সমিতি ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি কতকগুলো সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল। নেদারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছিল Life is not ours, Chittagong Hill Tract Commission Update-1,2,3 & 4।এসব সংগঠনগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং C.H.T. Commisson Life is not ours Update-4 এ কতকগুলো সুপারিশ প্রদান করেছিল। এসব সুপারিশগুলোঃ

ক) উন্নয়ন সম্পর্কে

খ) মানবাধিকার সম্পর্কে

গ) ভূমি ইস্যু সম্পর্কে এবং

ঘ) রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে করা হয়েছিল।

C.H.T Commission J.SS. এবং UPDF এর মধ্যে সশস্ত্র বিরোধি মিটাতে আগ্রহী। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ তথা UPDF এপ্রিল ২০০১ সালে ঢাকাতে এক সম্মেলন আয়োজন করেছিল। ঐ সম্মেলনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনসহ পাঁচ দফা দাবি নামা পেশ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল। পি.সি.পি.র পাঁচ দফা দাবি নামার সাথে C.H.T কমিশনের সুপারিশমালার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তথা বাংলাদেশের উপর চীনের ভূ-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের পর চীন দক্ষিন এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করে আসছে। বাংলাদেশ, বার্মা, নেপাল ও পাকিস্তানের সাথে চীন সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করছে এবং এসব দেশগুলোকে সামরিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ যদি কোন সময় দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রভাবাধীনে চলে যায় তবে চীন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি বিদ্রোহের শুরুতে চীনের হাত ছিল বলে বাংলাদেশের অনেক গবেষক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধ্যাপক ডঃ নুরুল আমিন, অধ্যাপক ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান ও অধ্যাপক নুরুজ্জামান এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শান্তি বাহিনি গঠনের পশ্চাতে এম.এস. লার্মার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মাঝে যে দার্শনিক ভিত্তি কাজ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম একটি ছিল চীনের সমর্থন দান।

মায়ানমার বাংলাদেশের অপর এক প্রতিবেশী দেশ এবং বাংলাদেশের দক্ষিনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত সংলগ্ন মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অনেক উপজাতিয়দের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির সাথে মায়ানমারের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশে বসবাসকারী অনেক উপজাতিয়দের মধ্যে মিল রয়েছে।

মায়ানমারের শান কোচিন ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ করে বান্দরবানের বসবাসকারী মারমাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। মায়ানমার বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অনেকবার হুমকির কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

মায়ানমারের ভূ-খন্ডকে (জনসংহতি সমিতি) ব্যবহার করে জনসংহতি সমিতিকে অনেকবার মদদ দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে মায়ানমারের অনেকগুলো সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপ রয়েছে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ করে বান্দরবান ও কক্সবাজারের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

RELEVANT EXTRACTS FROM THE CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION

1900 (1 OF 1900)

The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (1 of 1900) a regulation to declare the law applicable in and provide for the Administration of, the Chittagong Hill Tracts in Bengal.

(Received the assent of the Governor-General on the 13th idem; and in the Calcutta Gazette on the 17th idem)

Whereas it is expedient to declare the law applicable in and provide for the administration of, the Chittagong Hill Tracts in Bengal, it is hereby enacted as follows :

CHAPTER I - PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement :

   a. This Regulation my be called the Chittagong Hill Tracts Regulations, 1900.

   b. It extends to the Chittagong Hill Tracts

   c. It shall come into force on such date as the Local Government may, by notification in the Calcutta Gazette, appoint.

2. Definiation - In this Regulation :

   a. The expression "Chittagong Hill Tracts" means the area known by that name as existing on the first day on January 1936; and

   b. "Commissioner" means the Commissioner of the Chittagong Division.

Dhaka University Institutional Repository

CHAPTER II - LAWS

3. Chittagong Hill Tracts how to be administered-subject to the provisions of this Regulation, the administration of the CHT shall be carried on it accordance with the rules for the time being in force under section 18.

— — — —

CHAPTER - III - APPOINTMENT AND POWERS OF CERTAIN OFFICERS

5. Appointment of the Deputy Commissioner and subordinate officers - The Local Government may, by notification in the Calcutta Gazette :

a. Appoint any person to be the Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts; and

b. Appointment so many Deputy Magistrates and Deputy Collectors and other officers as it thinks fit to assist in the administration of the said Tracts.

— — — —

7. Chittagong Hill Tracts to be a district under the Deputy Commissioner. *The Chittagong Hill Tracts shall constitute a district for the purpose of criminal and civil jurisdiction and for revenue and general purposes, the Deputy Commissioner* shall be the District Magistrate and subject to any orders passed by the Local Government under section 5, the general administration of the said Tracts, in criminal civil, revenue and all other matters shall be vested in the Deputy Commissioner.*

8. Chittagong Hill Tracts to be sessions division under the Commissioner :

Dhaka University Institutional Repository

1. The Chittagong Hill Tracts shall constitute a sessions division and the Commissioner shall be the Sessions Judge.

2. As Sessions Judge the Commissioner may take congnizance of any offence as a court of original jurisdiction, without the accused being committed to him by the Magistrate for trial and when so taking cognizance, shall follow the procedure prescribed by the code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1998), for the trial of warrant - cases by Magistrate.

9. **HIGH COURT :** The Local Government shall exercise the powers of High Court for the purpose of the Submission of sentences of death for confirmation under the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. V of 1998) and the Commissioner shall exercise the powers of High Court for all other purpose of the said Code.

10. **POWER TO WITHDRAW CASES :** The Deputy Commissioner* may withdraw any criminal or civil cases pending before any officer or Court in Chittagong Hill Tracts and may either try it himself or refer it for trial to some other officer or court.

CHAPTER - IV - ARMS, AMMUNITION, DRUGS AND LIQUOR

11. Possession of firearms and ammunitions and manufacture of Gun powder -

(1) The Deputy Commissioner may fix the number of firearms and the quantity and description of ammunition which may be possessed by the inhabitants of any village and may grant permission, either to such inhabitants collectively or to any of them individually, to possess such firearms and ammunition as he may think fit.

— — — —

(3) Any permission granted under sub-section (1) to possess fire-arms and ammunition may be withdrawn by the Deputy

Dhaka University Institutional Repository

Commissioner $ and thereupon all firearms and ammunitions referred to in such permission shall be delivered to the Deputy Commissioner or one of his subordinates.

(4) The Deputy Commissioner $ may grant permission to any person to manufacture gun powder and may withdraw such permission.

(5) Whoever, without the permission of the Deputy Commissioner $ possesses or exports from the Chittagong Hill Tracts any firearms or ammunition or manufactures any gun powder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

— — — —

CHAPTER - V - MISCELLANEOUS

16. **POLICE** : The Chittagong Hill Tracts shall be seemed to be a general police district within the meaning of the Police Act, 1861 (V of 1861) and Bengal Act VII of 1869 (an Act to amend the constitution of the Police Force in Bengal), and the I.G. of Police, East Bengal shall exercise therein all the powers and authority conferred on an Inspector General of Police.

17. **CONTROL AND REVISION**

1. All officers in the Chittagong Hill Tracts shall be subordinate to the Deputy Commissioner,* who may revise any order made by any such officer including a Deputy Magistrate and Deputy Collector a Sub-Deputy Magistrate and Sub-Deputy Collector* under section 6.

2. The Commissioner may revise any order made under this Regulation by the Deputy Commissioner* or any other officer in the Chittagong Hill Tracts* except any order made in the matter of land Administration and land reforms.

Dhaka University Institutional Repository

3. The Local Government may revise any order made under this Regulation.

18. POWER TO MAKE RULES

1. The Local Government may make rules for carrying into effect the objects and purposes of this Regulation.

2. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may -

   a. Provide for the administration of civil justice in the Chittagong Hill Tracts;

   b. Prohibit, restrict or regulate the appearance of legal practitioners in cases arising in the said tracts;

   c. Provide for the registration of documents in the said tracts;

   d. Regulate or restrict the transfer of land in the said tracts;

   e. Provide for the sub-division of the said Tracts into circles and those circles into mouzas; +

   f. Provide for the collection of the rents and the administration of the revenue generally in the said circles and mouzas through the Chiefs and Headman;*

   g. Define the powers and jurisdiction of the Chiefs and Headman and regulate the exercise by them of such powers and jurisdiction;

   h. Regulate the appointment and dismissal of Headmen; *

   i. Provide for the remuneration of Chiefs, Headman and village officers generally by the assignment of lands for the purpose of otherwise as may be thought desirable; *

Dhaka University Institutional Repository

j. Prohibit, restrict or regulate the migration of cultivating ravats from one circle to another;

k. Regulate the acquisition by Government of land required for public purposes;

kk. Provide for compulsory vaccination in the said tracts;

i. Provide for the levy of taxes in the said tracts;

ii. Provide for the registration of persons who are habitual consumers of opium in the said Tracts; and

m. Regulate the procedure to be observed by officers acting under this Regulation or the rules for the time being in force thereunder;

dd. Provide for the control of money-lenders and the regulation and control of money-lending in the said Tracts.

(3) All rules made by the Local Government under this Section shall be published in the Calcutta and on such publication, shall have effect as if enacted by this regulation.

— — — —

19. Bar jurisdiction of Civil and Criminal Courts-Except as provided in this Regulation or in any other enactment for the time being in force, a decision passed, act done or order made under this Regulation or the rules thereunder, shall not be called in question in any Civil or Criminal Court.

— — — —

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি ঃ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ন ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসিদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

ক) সাধারণ ঃ

১. উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

২. উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতি সমূহ প্রনয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন।

৩. এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষন করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে।

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	ঃ	আহবায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান	ঃ	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য

৪. এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ ঃ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারা সমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১. পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি যথাযথ থাকিবে।

২. "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩. "অ-উপজাতি স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারনতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪. ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এর "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে - "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যা/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫. ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পুর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করিবেন - অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬. ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭. ১০ নম্বর ধারায় দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারনে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯. বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটের তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয় (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষনা না করিয়া থাকেন (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০.২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১.২৫ নম্বর ধরার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বিধান থাকিবে।

১২.যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অর্ন্তভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩.৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪.ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারন বা অন্য কোন প্রকার

শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

Dhaka University Institutional Repository

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিলে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারন অথবা অন্যকোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫. ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬. ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭.ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮. ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পুর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯. ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০. ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১. ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপুর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থি তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২. ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪.ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলায় উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫.৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিব।

২৬. ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন ও আমতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল্য মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭. ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮. ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯. ৬৮ নম্বার ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০.ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত " সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর উপ-ধারা (২) এর (৩) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পন" এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১. ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২. ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩.ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমুলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬ (খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪.পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) ভুমি ও ভুমি ব্যবস্থাপনা ;

খ) পুলিশ (স্থানীয়) ;

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ;

ঘ) যুব কল্যাণ ;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ;

চ) স্থানীয় পর্যটন ;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান ;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতিত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা ;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান সংরক্ষণ ;

ট) মহাজনী কারবার ;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫.দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি ;

Dhaka University Institutional Repository

খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর ;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর ;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর ;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস ;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর ;

ছ) খনিজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর ;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষন বা নিস্কার্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর ;

ট) লটারীর উপর কর ;

ঠ) মৎস ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ঃ

১. পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২. পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবে।

৩. চেয়ারম্যান সহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোনাং, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি থেকে ১জন নির্বাচিত হইবেন।

৪. পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫. পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬. পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিল করণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭. পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহি কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮. ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করা সহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগনিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারন প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা সহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০.পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১.১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দুর করা হইবে।

১২.পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩.সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪.নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ :

Dhaka University Institutional Repository

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা ;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান ;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা ;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোন অর্থ ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) **পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী ঃ**

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুর্নবাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১. ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ ৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ শে মার্চ ৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরিন উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্ট করণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২. সরকার ও জন সংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩. সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪. জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ

দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট) ;

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি ;

ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার ;

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬. ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করিবেন।

৭. যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহন করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকারী অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদ সহ মওকুফ করা হইবে।

৮. রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্রজেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯. সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০.কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র।ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১.উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতি স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকগণও সহায়তা করিবেন।

১২.জনসংহতি সমিতি উহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩.সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষনা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৪.নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৫.জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

১৬.ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুর্নবাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এফকালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিত কালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারনে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহন করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পুর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থান মুলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া শুনার সুযোগসুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭.ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতিত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময় সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরনে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮.পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেরণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯.উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রনালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী ;

২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ ;

৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ;

৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ;

৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ;

৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি ;

৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি ;

৮) সাংসদ, বান্দরবান ;

৯) চাকমা রাজা ;

১০) বোমাং রাজা ;

১১) মং রাজা ;

১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিন জন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

স্বাক্ষরিত ০২/১২/৯৭

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ)
আহবায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিদের পক্ষে

স্বাক্ষরিত ০২/১২/৯৭

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৪, ১৯৯৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪শে মে, ১৯৯৮/১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪শে মে, ১৯৯৮ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:--

১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, এবং অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিধেয় : এবং

যেহেতু এই অঞ্চল উপজাতীয় অধিবাসীগণসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরিউক্ত লক্ষ্য সহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইংরেজী তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে তিনটি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ-সমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং আনুষংগিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত একটি আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপে আইন করা হইল:--

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।--(১) এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৪·০০

Dhaka University Institutional Repository

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অ-উপজাতীয়" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন;

(খ) "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং উক্ত জেলার কোন সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় তিনি সাধারণতঃ বসবাস করেন;

(গ) "উপজাতীয়" অর্থ পার্বত্য জেলাসমূহে স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচৈংগ্যা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, ম্রো, বোম, খুমী ও চাক উপজাতীয় কোন সদস্য;

(ঘ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঙ) "পরিষদ" অর্থ এই আইনের অধীনে স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ;

(চ) "পার্বত্য জেলা" অর্থ রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা;

(ছ) "পার্বত্য জেলা পরিষদ" অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;

(জ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঞ) "সদস্য" অর্থ পরিষদের সদস্য;

(ট) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে গঠিত পার্বত্য জেলার কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপন।—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। পরিষদের কার্যালয়, ইত্যাদি।—(১) পরিষদের প্রধান কার্যালয় পার্বত্য জেলাসমূহের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে থাকিবে।

(২) পরিষদ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, পার্বত্য জেলাসমূহে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। পরিষদের গঠন।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে পরিষদ নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) বার জন উপ-জাতীয় সদস্য;

(গ) ছয় জন অ-উপজাতীয় সদস্য;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) দুইজন উপজাতীয় মহিলা সদস্য;

(ঙ) একজন অ-উপজাতীয় মহিলা সদস্য;

(চ) তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে।

(২) চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৩) উপ ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত উপ-জাতীয় সদস্যগণের মধ্যে—

(ক) পাঁচজন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে;

(খ) তিনজন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে;

(গ) দুইজন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে;

(ঘ) একজন নির্বাচিত হইবেন ম্রো ও তনচৈংগা উপজাতি হইতে;

(ঙ) একজন নির্বাচিত হইবেন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

(৪) উপ-ধারা ১(গ) তে উল্লিখিত অ-উপজাতীয় সদস্যগণ প্রতিটি পার্বত্য জেলা হইতে দুইজন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

(৫) উপ-ধারা ১ (ঘ) তে উল্লিখিত দুইজন উপজাতীয় মহিলা সদস্যগণের একজন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতির মহিলাগণের মধ্য হইতে এবং অপর একজন নির্বাচিত হইবেন অন্যান্য উপজাতির মহিলাগণের মধ্য হইতে।

(৬) উপ-ধারা ১ (ঙ) তে উল্লিখিত একজন অ-উপজাতীয় মহিলা সদস্য পার্বত্য জেলা তিনটির অ-উপজাতীয় মহিলাগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৭) উপ-ধারা (১) (চ) এ উল্লিখিত পরিষদের সদস্যগণের ভোটাধিকার থাকিবে।

(৮) কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্ব সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৯) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৬। **চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের নির্বাচন।**—ধারা ৫(১) (চ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্য সকল সদস্য পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক বিধি অনুসারে নির্বাচিত হইবেন।

৭। **চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৮। **উপ-জাতীয় ও অ-উপজাতীয় সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, কোন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, কোন উপজাতীয় অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি তাহার উপজাতির জন্য নির্ধারিত আসনে উপজাতি সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, কোন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, অ-উপজাতীয় হইলে এবং তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-উপজাতীয়দের জন্য নির্ধারিত আসনে অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-জাতীয় বা অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) তাহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;

(ঙ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধের দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা পার্বত্য জেলার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;

(জ) তাহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক বা অন্য কোন তফসিলি ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

ব্যাখ্যা।—দফা (জ) এ উল্লিখিত "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

৯। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ।**—চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন, যথা ঃ—

"আমি..... পিতা/স্বামী..... পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।"

১০। **সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা।**—চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ নির্বাচন বিধি অনুসারে দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা: "পরিবারের সদস্য" বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাঁহার সংগে বসবাসকারী এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাঁহার ছেলেমেয়ে, পিতা-মাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা।—(১) চেয়ারম্যান সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর অনুরূপ পদ মর্যাদা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(২) অন্যান্য সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। পরিষদের মেয়াদ।—৪১ ধারার বিধান অনুসারে বাতিল না হইলে, পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নতুন পরিষদ প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ।—(১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১৪। চেয়ারম্যান, ইত্যাদির অপসারণ।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

(গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারায় 'অসদাচরণ' বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহূত পরিষদের বিশেষ সভায় ধারা ৫(১)(চ) এ উল্লেখিত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন চতুর্থাংশ ভোটে তাঁহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তি সংগত সুযোগ দান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৫। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি—

(ক) তাঁহার নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৯ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন :

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;

(খ) তিনি ধারা ৭ ও ৮ এর অধীনে তাঁহার পদে থাকার অযোগ্য হইয়া যান;

(গ) তিনি ধারা ১৩ এর অধীনে পদ ত্যাগ করেন;

(ঘ) তিনি ধারা ১৪ এর অধীনে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর ধারা ৭ বা ৮ এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কিনা সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে, বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিষদের প্রধান কার্যালয় যে পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সেই জেলার উপর এখতিয়ারসম্পন্ন জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরূপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীনে কোন প্রশ্ন জেলাজজের নিকট উত্থাপিত হইলে, উক্ত প্রশ্ন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলাজজ প্রশ্নটির উপর অভিমত প্রদান করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে বিষয়টি, সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য, উক্ত পদ শূন্য হইবার তারিখ উল্লেখক্রমে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

১৬। অস্থায়ী চেয়ারম্যান।—চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সদস্যগণ উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করিবেন এবং এইরূপে নির্বাচিত সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৭। উপনির্বাচন।—পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার অথবা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১৫(২) এর অধীনে পদটি শূন্য হইয়াছে মর্মে জেলাজজ কর্তৃক অভিমত প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৮। পরিষদের নির্বাচনের সময়।—(১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ষাট দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ৪১ ধারার বিধান অনুসারে পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, ৪১ (৩) ধারা মোতাবেক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯। **দুই পদের জন্য একই সংগে প্রার্থী হওয়া যাইবে না।**—কোন ব্যক্তি একই সংগে চেয়ারম্যান এবং সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। **নির্বাচন পরিচালনা।**—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন অতঃপর, নির্বাচন কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাঁহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) ভোটার তালিকা প্রণয়ন;

(গ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;

(ঘ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঙ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহার;

(চ) প্রার্থীদের এজেন্ট নিয়োগ;

(ছ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

(জ) ভোট গ্রহণের সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(ঝ) ভোট দান পদ্ধতি;

(ঞ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবণ্টন;

(ট) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(ঠ) নির্বাচনী ব্যয়;

(ড) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দণ্ড;

(ঢ) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং

(ণ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা (২)(ড) এর অধীনে প্রণীত বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে, কারাদণ্ডের মেয়াদ দুই বৎসরের অধিক এবং অর্থ দণ্ডের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ।—চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। পরিষদের কার্যাবলী।—পরিষদের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা অনুসারে পরিষদ কর্তৃক তত্ত্বাবধান বা সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে, কোন বিষয়ে কোন পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আঞ্চলিক পরিষদের বা একাধিক পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে, পরিষদের সিদ্ধান্ত, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, চূড়ান্ত হইবে;

(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন ;

(গ) Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance, 1976 (LXXVII of 1976) দ্বারা স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যাবলীর সার্বিক তত্ত্বাবধান;

(ঘ) পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

(ঙ) উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান;

(চ) জাতীয় শিল্প নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া পার্বত্য জেলাসমূহে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান;

(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;

২৩। নির্বাহী ক্ষমতা।—(১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।

(২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমানীকৃত বা সম্পাদিত হইতে হইবে।

২৪। কার্যাবলী নিষ্পন্ন।—(১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) পরিষদের কোন সদস্য পদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৫। **কমিটি**।—পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উহরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৬। **চুক্তি**।—(১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি—

(ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে।

(খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

২৭। **নথি-পত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি**।—পরিষদ—

(ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(খ) প্রবিধানে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮। **পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা**।—পরিষদের একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং তিনি সরকারের যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় কর্মকর্তাগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

২৯। **পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই সব পদে নিয়োগে পার্বত্য জেলাসমূহের উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে বিধি অনুযায়ী সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। **ভবিষ্য তহবিল, ইত্যাদি।**—(১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) পরিষদ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে প্রবিধান অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদান্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গ্র্যাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩১। **চাকুরী প্রবিধান।**—পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩২। **পরিষদের তহবিল, ইত্যাদি।**—(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রদেয় অর্থ, যাহার পরিমাণ সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তি, যদি থাকে, হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা ;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত মুনাফা ;

(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ ;

(ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৩। **পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারী বা উহার কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে রাখা হইবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের অর্থ পরিষদের প্রয়োজনে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ, ইচ্ছা করিলে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৪। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ।—(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, ব্যয় করা যাইবে, যথা:—

প্রথমত: পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান ;

দ্বিতীয়ত: উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় ;

তৃতীয়ত: এই আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় ;

চতুর্থত: সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় ;

পঞ্চমত: সরকার, কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ ;

(খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব-নিরীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঘ) বিধি দ্বারা দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয়;

Dhaka University Institutional Repository

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে ঐ অর্থ যতদূর সম্ভব, পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৫। বাজেট।—(১) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কোন অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথমবার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ-বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় পরিষদ প্রয়োজন মনে করিলে সেই অর্থ বৎসরের জন্য প্রণীত বা অনুমোদিত বাজেট পুনঃ প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

৩৬। হিসাব।—(১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষা করা হইবে।

(২) প্রতিটি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থবৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উক্ত বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে সাঁটিয়া দিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদে বিবেচনা করিবে।

৩৭। হিসাব নিরীক্ষা।—(১) পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

(২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা :—

(ক) অর্থ আত্মসাৎ;

(খ) পরিষদ—তহবিলের লোকসান অপচয় এবং অপপ্রয়োগ ;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) হিসাবরক্ষণে অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ বা অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৩৮। পরিষদের সম্পত্তি।—(১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ—

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন করিতে পারিবে;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;

(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৩৯। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান, ইত্যাদির দায়।—পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে, উহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাহার এই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারী দাবী (public demand) হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে সরকার, প্রয়োজনে, পরিষদকে পরামর্শ বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(২) সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ পায় যে, পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম সংবিধান বা এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার, লিখিতভাবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং, প্রয়োজনবোধে, পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং পরিষদ উক্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সরবরাহ করিবে বা পরামর্শ বাস্তবায়ন করিবে।

৪১। পরিষদ বাতিলকরণ।—(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ—

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, পরিষদকে বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে—

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাতিলাদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

৪২। **পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ।**—পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৪৩। **আপীল।**—এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৪৪। **পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন।**—পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে এতদ বিষয়ে সরকার বা পরিষদ পরস্পরের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বা আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হইবে।

৪৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:—

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;

(গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;

(ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;

(ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;

Dhaka University Institutional Repository

(চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এমন যে কোন বিষয়।

(৩) কোন বিধি প্রণয়নের পর পরিষদের বিবেচনায় যদি উক্ত বিধি পার্বত্য অঞ্চলের জন্য কষ্টকর বা আপত্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে পরিষদ সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনা, সংশোধন, বাতিল বা উহার প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৬। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা যে কোন বিষয়ের বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা;

(খ) পরিষদের সভার কোরাম নির্ধারণ;

(গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উত্থাপন;

(ঘ) পরিষদের সভা আহ্বান;

(ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন;

(চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন;

(ছ) পরিষদের সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার;

(জ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ;

(ঝ) কার্যনির্বাহী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;

(ঞ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃঙ্খলা;

(ট) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ;

(ঠ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

(৩) পরিষদের বিবেচনায় যে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান প্রণয়নের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিষদ উক্ত প্রবিধানের অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। **পরিষদের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা।**—(১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ—

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে প্রদান করিবেন বা পেঁৗছাইয়া দিবেন;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিবেন, বা পেঁৗছাইয়া দিবেন।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পেঁৗছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পেঁৗছানো হইয়াছে কি না উহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৪৮। **নোটিশ এবং উহার জারীকরণ।**—(১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা ইহা করা হইতে বিরত থাকা যদি কোন ব্যক্তির কর্তব্য হয়, তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে উহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার উপর একটি নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন প্রকাশ্য স্থানে সাঁটিয়া দিয়া জারী করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে সাঁটিয়া দিয়া জারী করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৯। **প্রকাশ্য রেকর্ড।**—এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার Evidance Act, 1872 (1 of 1872) তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে সঠিক রেকর্ড বা রেজিস্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৫০। **পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন।**—পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।**—এই আইন, বিধি বা প্রবিধানে এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী-এর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৫২। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—(১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নম্বর আইন) যদি কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসঙ্গতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

৫৩। **আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদের সহিত আলোচনা, ইত্যাদি।**—(১) সরকার পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে এবং পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এই রূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবে।

৫৪। **ক্রান্তিকালীন বিধান।**-(১) ধারা ৩ এর অধীনে পরিষদ স্থাপনের পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ, অতঃপর অন্তর্বর্তী পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিবে।

(২) অন্তর্বর্তী পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং তাহাদের মনোনয়ন ক্ষেত্রে ধারা ৭ ও ৮ এ উল্লিখিত যোগ্যতা ও অযোগ্যতা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) অন্তর্বর্তী পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্য যে কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) অন্তর্বর্তী পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই আইনের ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৫) ধারা ৫ অনুসারে পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী পরিষদ ধারা ২২ এ উল্লিখিত কার্যাবলী যতটুকু প্রযোজ্য হয়, এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৬) ধারা ৯ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ বা তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শপথ গ্রহণের সংগে সংগে অন্তর্বর্তী পরিষদের অস্তিত্বও আপনা আপনি বিলুপ্ত হইবে।

খোন্দকার আবদুল হক
অতিরিক্ত সচিব।

মুহম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ-সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট-৪

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৬, ১৯৮৯

৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫/৬ই মার্চ, ১৯৮৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ৬ই মার্চ, ১৯৮৯ (২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু রাংগামাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা বিধায় উহার সর্বাংগীন উন্নয়নকল্পে উহার জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অ-উপজাতীয়" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন;

(খ) "উপজাতীয়" অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচৈংগা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু ও খেয়াং উপজাতির সদস্য;

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

মূল্য: টাকা ১৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) "পরিষদ" অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ;

(চ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;

(ঝ) "সদস্য" অর্থ পরিষদের সদস্য।

৩। **রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপন।**—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **পরিষদের গঠন।**—(১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) বিশ জন উপজাতীয় সদস্য;

(গ) দশ জন অ-উপজাতীয় সদস্য;

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(৩) উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে—

(ক) দশ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে;
(খ) চার জন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে;
(গ) দুই জন নির্বাচিত হইবেন তনচৈংগা উপজাতি হইতে;
(ঘ) এক জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে;
(ঙ) এক জন নির্বাচিত হইবেন লুসাই উপজাতি হইতে;
(চ) এক জন নির্বাচিত হইবেন পাংখু উপজাতি হইতে;
(ছ) এক জন নির্বাচিত হইবেন খেয়াং উপজাতি হইতে।

(৪) চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা জেলার ডেপুটি কমিশনার স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫। **চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

৬। **উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, কোন উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান

Dhaka University Institutional Repository

সাপেক্ষে, তিনি তাঁহার উপজাতির জন্য নির্ধারিত আসনে উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, অ-উপজাতীয় হইলে, এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-উপজাতীয়দের জন্য নির্ধারিত আসনে অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় বা অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) তাঁহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(গ) তিনি দেওলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাংগামাটি পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;

(ঙ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন অধীনে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;

(জ) তিনি পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের দোকানদার হন; অথবা

(ঝ) তাঁহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

৭। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ।**—চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন, যথা:—

"আমি, ..., পিতা বা স্বামী .....
....., রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব"।

৮। **সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা।**—চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা।—"পরিবারের সদস্য" বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাঁহার সংগে বসবাসকারী এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাঁহার ছেলেমেয়ে, পিতা-মাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা।—চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। পরিষদের মেয়াদ।—পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে তিন বৎসর:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নূতন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ।—(১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

(গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় "অসদাচরণ" বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহূত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে তাঁহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি—

(ক) তাঁহার নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৭ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;

(খ) তিনি ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে তাঁহার পদে থাকার অযোগ্য হইয়া যান;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) তিনি ধারা ১১ এর অধীনে তাহার পদ ত্যাগ করেন;

(ঘ) তিনি ধারা ১২ এর অধীনে তাহার পদ হইতে অপসারিত হন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার নির্বাচনের পর ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কি না সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে, নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের সচিব কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে, এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরূপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান।—চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা।—পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার ষাট দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়।—(১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ষাট দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে :

* "তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে যদি কোন বিশেষ কারণে এই উপ-ধারায় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী ১৮২০ দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।"

(২) পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্বে পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

** "১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ।—(১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চার সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

---

* ১৯৯২ সনের ৩১ নং আইন দ্বারা সংযোজিত এবং ১৯৯৭ সনের ২নং আইন দ্বারা সংশোধিত।
** ১৯৯৭ সনের ২নং আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"

১৭। ভোটার তালিকা।—জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকায় যে অংশ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাভুক্ত এলাকা সংক্রান্ত ভোটার তালিকায় সেই অংশ পরিষদের যে কোন নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে।

১৮। ভোটাধিকার।—কোন ব্যক্তির নাম, ধারা ১৭তে উল্লিখিত ভোটার তালিকায় আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকিলে তিনি পরিষদের যে কোন নির্বাচন ভোট দিতে পারিবেন।

১৯। দুই পদের জন্য একই সংগে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ।—কোন ব্যক্তি একই সংগে চেয়ারম্যান এবং উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। নির্বাচন পরিচালনা।—(১) সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন, অতঃপর নির্বাচন কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;

(গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার;

(ঙ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

(ছ) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(জ) ভোট দানের পদ্ধতি;

(ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবন্টন;

(ঞ) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(ট) নির্বাচনী ব্যয়;

(ঠ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দন্ড;

(ড) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং

(ঢ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা (২) (ঠ) এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদন্ডের মেয়াদ দুই বৎসরের অধিক এবং অর্থদন্ডের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২১। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ।**—চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। **পরিষদের কার্যাবলী।**—প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হইবে, এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

২৩। **সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি।**—এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে—

(ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে;

হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪। **নির্বাহী ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।

(২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে।

২৫। **কার্যাবলী নিষ্পন্ন।**—(১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) পরিষদের কোন সদস্য শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভায় কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৬। **চাকমা চীফের পরিষদের সভায় যোগদানের অধিকার।**—রাংগামাটি চাকমা চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২৭। **কমিটি।**—পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৮। চুক্তি।—(১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি—

(ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে;

(খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

২৯। নির্মাণ কাজ।—পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করার বিধান করিবে;

(খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে উহার বিধান করিবে;

(গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হইবে উহার বিধান করিবে।

৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি।—পরিষদ—

(ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(খ) প্রবিধানে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। পরিষদের সচিব।—(১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকারবলে পরিষদের সচিব হইবেন।

(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে পরিষদের সভা আহবান, সভায় পরিচালনা ও সভার কার্যসূচী নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।—(১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। **ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি।**—(১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) পরিষদ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাঁহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদান্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গ্র্যাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। **চাকুরী প্রবিধান।**—পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩৫। **পরিষদের তহবিল গঠন।**—(১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ;

(খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;

(জ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৬। **পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি।**—(১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে রাখা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৭। **পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ।**—(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা—

প্রথমতঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

দ্বিতীয়তঃ এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

তৃতীয়তঃ এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

চতুর্থতঃ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

পঞ্চমতঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;

(খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব-নিরীক্ষণ বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে, যতদূর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৮। **বাজেট।**—(১) প্রতি অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কোন অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার আদেশ দ্বারা, বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথম বার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ-বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ-বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। **হিসাব।**—(১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) প্রতিটি অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ-বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদ বিবেচনা করিবে।

৪০। হিসাব নিরীক্ষা।—(১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

(২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) অর্থ আত্মসাৎ;

(খ) পরিষদ তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;

(গ) হিসাব রক্ষণে অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৪১। পরিষদের সম্পত্তি।—(১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ—

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করিতে পারিবে;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;

(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা।—(১) পরিষদ, উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হইবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হইবে;

(খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে;

(গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

(৩) পরিষদ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। **পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়।**—পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে উহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাঁহার এই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪৪। **পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর ইত্যাদি।**—পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে।

৪৫। **কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি।**—(১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে, এবং সরকার ভিন্নরূপে নির্দেশ না দিলে, উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

৪৬। **কর সংক্রান্ত দায়।**—কোন ব্যক্তি বা জিনিষপত্রের উপর কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কি না উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে পরিষদ, নোটিশের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র, হিসাব বহি বা জিনিষপত্র হাজির করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৭। **কর আদায়।**—(১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা, নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় করা হইবে।

(২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৮। **কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি।**—প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় এই আইনের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদসংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির উহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৯। **কর প্রবিধান।**—(১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস এবং অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

(২) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর দাতাদের তালিকা এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্তা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

৫০। **পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান।**—এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের, নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।—(১) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার আদেশ দ্বারা—

(ক) পরিষদের কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে;

(গ) প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদকে আদেশে উল্লিখিত কোন কাজ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে পরিষদ আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রতিবাদ করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত প্রতিবাদ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার উক্ত আদেশটি হয় বহাল রাখিবে নতুবা সংশোধন অথবা বাতিল করিবে।

(৪) যদি কোন কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত আদেশ বহাল অথবা সংশোধন করা না হয় তাহা হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত।—(১) সরকার, স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা/তৎসংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্যও নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের, প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণের জন্য Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ।—(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ—

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

(ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;

তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, পরিষদকে, উহার মেয়াদের অবশিষ্ট কার্যকালের অনধিক কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাতিল করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে –

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

৫৪। যুক্তকমিটি।—পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিকে উহার যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ।—পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। অপরাধ।—তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৫৭। দণ্ড।—এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অনধিক পঁচিশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক পাঁচশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।—চেয়ারম্যান বা পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার।—চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ।—(১) জনপথ ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে পদার্পণ করিবেন না।

(২) উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে পরিষদ নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধভাবে পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে পরিষদ অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবৈধ পদার্পণকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেইজন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

(৩) অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর উপর এই আইনের অধীন ধার্য কর বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬১। **আপীল।**—এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি-সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬২। **জেলা পুলিশ।**—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তদূর্ধ্ব স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দারের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী, তাঁহাদের প্রশিক্ষণ, সাজসজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাঁহাদের পরিচালনা অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন, উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে, আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৬৩। **পুলিশের দায়িত্ব।**—রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে ইহার তথ্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইহার কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।

৬৪। **ভূমি হস্তান্তরে বাধানিষেধ।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্তো দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত (Protected ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা-জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা-জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৬৫। **ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলায় আদায়কৃত উক্ত করের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিষদের তহবিলে অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

৬৬। **উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।**—(১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা এমন উপজাতীয়গণের মধ্যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কারবারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতীয়গণের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) কারবারী বা হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাংগামাটি চাকমা চীফের নিকট আপীল করা যাইবে।

(৩) চাকমা চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাঁহারি সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতি হইতে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন তিন জন উপজাতীয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই ধারায় উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য—

(ক) বিচার পদ্ধতি,

(খ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস,

নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। **পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ।**—সরকার, প্রয়োজন হইলে, আদেশ দ্বারা পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয়ের বিধান করিতে পারিবে।

৬৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;

(গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;

(ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;

(ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;

(চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

৬৯। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা,

(খ) পরিষদের সভায় কোরাম নির্ধারণ,

(গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উত্থাপন,

(ঘ) পরিষদের সভা আহ্বান,

(ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন,

(চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন,

(ছ) সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার,

Dhaka University Institutional Repository

(জ) পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ,

(ঝ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ,

(ঞ) কার্যনির্বাহী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়,

(ট) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃংখলা,

(ঠ) কর, রেইট, টোল এবং ফিস ধার্য ও আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়,

(ড) পরিষদের সম্পত্তিতে অবৈধ পদার্পণ নিয়ন্ত্রণ,

(ঢ) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় রেজিস্ট্রীকরণ,

(ণ) এতিমখানা, বিধবা সদন এবং দরিদ্রদের ত্রাণ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ,

(ত) জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(থ) টীকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,

(দ) সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ,

(ধ) খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধ,

(ন) সমাজের বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ,

(প) বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ,

(ফ) জনসাধারণের ব্যবহার্য ফেরীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(ব) গবাদি পশুর খোয়াড়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(ভ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ,

(ম) মেলা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ,

(য) বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,

(র) ভিক্ষাবৃত্তি, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ,

(ল) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ,

(শ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

(৩) পরিষদের বিবেচনায় যে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

৭০। **ক্ষমতা অর্পণ।**—সরকার এই আইনের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৭১। **পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা।**—(১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া এক্টি নোটিশ—

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাঁহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান না পৌঁছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৭২। **নোটিশ এবং উহা জারীকরণ**।—(১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা হইতে বিরত থাকা যদি ব্যক্তির কর্তব্য হয় তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে ইহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপর একটি নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপকের হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাঁহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাঁহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন বিশিষ্ট স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারী করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারী করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। **প্রকাশ্য রেকর্ড**।—এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার Evidence Act, 1872 (I of 1872)-তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে বিশুদ্ধ রেকর্ড বা রেজিস্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৭৪। **পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন**।—পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৫। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।—এই আইন, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হইবার সংগে সংগে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে রহিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উক্ত আইন উক্তরূপে রহিত হইবার পর,—

(ক) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, অতঃপর উক্ত জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিধি, প্রবিধান ও বাই-ল, প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল আদেশে, জারীকৃত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সকল বাই-ল প্রবিধান বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয়, উহার যাবতীয় অধিকার বা উহাতে ন্যস্ত যাবতীয় স্বার্থ পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(ঘ) উক্ত জেলা পরিষদের যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা বা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং পরিষদ কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(চ) উক্ত জেলা পরিষদের প্রাপ্য সকল কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই আইনের অধীন পরিষদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;

(ছ) উক্ত আইন রহিত হইবার পূর্বে উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল ও ফিস এবং অন্যান্য দাবী, পরিষদ কর্তৃক, পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, একই হারে অব্যাহত থাকিবে;

(জ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদে বদলী হইবেন ও উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং তাঁহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরীরত ছিলেন, পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে, সেই শর্তেই তাঁহারা উহার অধীনে চাকুরীরত থাকিবেন;

(ঝ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৭। **নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি।**—এই আইনের কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কাজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

৭৮। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি।- রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রথম তফসিল

পরিষদের কার্যাবলী

[ধারা ২২ দ্রষ্টব্য]

১। জেলার আইন শৃংখলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।

২। জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা—

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) স্বাস্থ্যবৃত্তির ব্যবস্থা;

(ঘ) ছাত্রাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান;

(ছ) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা;

(জ) শিশু ছাত্রদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ ও খাদ্যের ব্যবস্থা;

(ঝ) গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ;

(ঞ) পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। স্বাস্থ্য—

(ক) হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেনসারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল গঠন, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য সমিতি গঠনে উৎসাহ দান;

(গ) ধাত্রী প্রশিক্ষণ;

(ঘ) ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(চ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন;

(ছ) কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীর কার্য পরিদর্শন;

(জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রস্তাব।

৬। কৃষি ও বন--

(ক) কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বা রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

(গ) উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান;

(ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ;

(চ) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কোন ব্যাঘাত না ঘটাইয়া বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষিকার্যে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন;

(জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন;

(ঝ) শষ্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্যে বীজের ঋণ দান, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ;

(ঞ) রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।

৭। পশু পালন--

(ক) পশুপাখী উন্নয়ন;

(খ) পশুপাখীর হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) পশু খাদ্যের মজুদ গড়িয়া তোলা;

(ঘ) গৃহপালিত পশুসম্পদ সংরক্ষণ;

(ঙ) চারণ ভূমির ব্যবস্থা ও উন্নয়ন;

(চ) পশুপাখীর ব্যাধি প্রতিরোধ ও দূরীকরণ এবং পশুপাখীর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) দুগ্ধ পল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ;

(জ) গৃহপালিত পশু খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঝ) হাঁস-মুরগী খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঞ) গৃহপালিত পশু ও হাঁসমুরগী পালন উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) দুগ্ধ খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

৮। মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

১০। শিল্প ও বাণিজ্য--

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) স্থানীয় ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) হাট বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাত-করণের ব্যবস্থা,

(ঙ) গ্রামভিত্তিক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) গ্রাম বিপণী স্থাপন ও সংরক্ষণ।

১। সমাজকল্যাণ—

(ক) দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, অনাথ আশ্রয়, এতিমখানা, বিধবা সদন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ;

(ঘ) জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর উন্নয়ন;

(ঙ) দরিদ্রদের জন্য আইনের সাহায্য (লিগ্যাল এইড) সংগঠন;

(চ) সালিশী ও আপোষের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) দুঃস্থ ও ছিন্নমূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;

(জ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। সংস্কৃতি—

(ক) সাধারণ ও উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠন ও উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) জনসাধারণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধুলার উন্নয়ন;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে রেডিওর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) যাদুঘর ও আর্ট-গ্যালারী স্থাপন ও প্রদর্শনীর সংগঠন;

(ঙ) পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থা;

(চ) নাগরিক শিক্ষার প্রসার, এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন, কৃষি, শিক্ষা, গবাদি পশু, প্রজনন সম্পর্কিত এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য প্রচার;

(ছ) জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদ্‌যাপন;

(জ) বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা;

(ঝ) শরীরচর্চার উন্নয়ন, খেলাধুলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা;

(ঞ) স্থানীয় এলাকায় ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্টসমূহ সংরক্ষণ;

(ট) তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঠ) সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলো এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজকরণ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রণয়ন।

২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

দ্বিতীয় তফসিল

পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস

[ধারা ৪৪ দ্রষ্টব্য]

১। স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ।

২। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৩। পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল।

৪। পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট।

৫। পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস।

৬। পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হইতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস।

৭। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস।

৮। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।

তৃতীয় তফসিল

এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ

[ধারা ৫৬ দ্রষ্টব্য]

১। পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

২। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে পরিষদ কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।

৩। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সে কার্য বিনা লাইসেন্সে বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথে অবৈধ পদার্পণ।

৫। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজনক হওয়ার সন্দেহে এই আইনের অধীন কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

৭। জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা-পেশাব করানো বা গোসল করানো।

৮। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য কোন গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

৯। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

১০। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি খনন, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

১১। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটি, চুন-ভাটি, কাঠ-কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

১২। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

১৩। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন জমি বা ইমারত হইতে আবর্জনা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোন পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।

১৪। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুণ্ড, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে, অপসারণে, মেরামতে, পরিষ্কার করিতে, জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

১৫। এই আইনের অধীন কোন আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্মে জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষণা করা সত্ত্বেও, ইহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

১৬। জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতা গুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুকুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা উহা এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাঁটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

১৭। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শষ্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

১৮। এই আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাল বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের জন্য কোন উৎস পরিস্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২০। এই আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে কোন পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২১। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

২২। কোন দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির পরিষদকে খবর দিতে ব্যর্থতা।

২৩। সংক্রামক রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত কোন দালানকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২৪। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা।

২৫। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

২৬। দুধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

২৭। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।

২৮। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো ;

২৯। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি নিমতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত বা গলিত অংশ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৩০। এতদুদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

৩১। কোন বৃক্ষ বা উহার শাখা কর্তন বা কোন দালান বা উহার কোন অংশ নির্মাণ বা ভাংচুর এই আইনের অধীন জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক বা বিরক্তিকর বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার কর্তন, নির্মাণ বা ভাংচুর।

৩২। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণ।

৩৩। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন বিজ্ঞাপন, নোটিশ, প্ল্যাকার্ড বা অন্য কোন প্রকার প্রচারপত্র আটিয়া দেওয়া।

৩৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তূপিকৃত করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাতে যানবাহন বা জীব-জন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তাবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৩৬। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

৩৭। সূর্যাস্তের অর্ধঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধঘন্ট পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহনে যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৩৮। যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য কোন যানবাহনের ডান পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি না মানা।

৩৯। এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা ভংগ করিয়া রেডিও বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ঢাকঢোল পিটানো, ভেপু বাজানো, অথবা কাঁসা বা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

৪০। আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতসবাজী, এমনভাবে ছোড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪১। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৪২। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা বা শবদাহ করা।

৪৩। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

৪৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন দালানকে ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

৪৫। এই আইনের অধীন মনুষ্য-বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৪৬। এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন দালান চুনকাম বা মেরামত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে ব্যর্থতা।

৪৭। এই আইন বা কোন বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারীকৃত কোন বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

৪৮। এই তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৯৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩/২০শে মাঘ, ১৩৯৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ (২০শে মাঘ, ১৩৯৯) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

১৯৯৩ সনের ১ নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১২ই ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং মোতাবেক ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**— রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৮০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৫৪৫" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **রহিতকরণ।**— রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং ১০, ১৯৯২) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

মূল্য: টাকা ২.০০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সনের ২ নং আইন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইং মোতাবেক ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**— খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৮০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৫৪৫" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **রহিতকরণ।**— খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং ১১, ১৯৯২) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

১৯৯৩ সনের ৩ নং আইন

বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইং মোতাবেক ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।— বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৮০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৫৪৫" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। রহিতকরণ।— বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং ১২, ১৯৯২) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

আবদুল হাসেম
সচিব।

সামসউদ্দিন রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

রেজিস্টার্ড নং ডি. এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৯৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭/২০শে মাঘ, ১৪০৩

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ (২০শে মাঘ, ১৪০৩) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

১৯৯৭ সনের ২ নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ২ এর বিধান ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং মোতাবেক ২১শে পৌষ, ১৪০৩ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৬৪০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৮২০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য : টাকা ২.০০

Dhaka University Institutional Repository

৩। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের নূতন ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পর নিম্নরূপে নূতন ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ।— (১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নূতন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নূতন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"।

৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৭ (অধ্যাদেশ নং ১, ১৯৯৭) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৯৭ সনের ৩ নং আইন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ২ এর বিধান ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং মোতাবেক ২১শে পৌষ, ১৪০৩ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ১৯৮৯ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৬৪০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৮২০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ১৯৮৯ সনের ২৯ নং আইনের নূতন ধারার সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ।— (১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নূতন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নূতন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"।

৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৭ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৯৭) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৯৭ সনের ৪ নং আইন

বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) এই আইনের ধারা ২ এর বিধান ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং মোতাবেক ২১শে পৌষ, ১৪০৩ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৬৪০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৮২০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের নূতন ধারার সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৬ক। **অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ।**— (১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নূতন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নূতন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৭ (অধ্যাদেশ নং ৩, ১৯৯৭) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবুল হাশেম
সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট-৭

Dhaka University Institutional Repository

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৪, ১৯৯৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪শে মে, ১৯৯৮/১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ২৪শে মে, ১৯৯৮ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু রাংগামাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি জেলা; এবং

যেহেতু উক্ত জেলার উপজাতীয় অধিবাসীগণসহ সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরি-উক্ত লক্ষ্যসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইংরেজী তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এই আইন রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

(৬১৯৯)

মূল্য : টাকা ৬.০০

Dhaka University Institutional Repository

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের পূর্ণাংগ শিরোনামা সংশোধন।—রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাংগ শিরোনামা (long title) এর "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) এর "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে বা যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন;";

(খ) দফা (ঙ) এর "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ঝ) এর শেষে দাঁড়ির পরিবর্তে একটি সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ দফা সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঞ) "সার্কেল চীফ" অর্থ চাকমা চীফ।"।

৫। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপাত্তটীকাসহ উক্ত ধারায় উল্লিখিত "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৬। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) তিনজন মহিলা সদস্য, যাহাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অ-উপজাতীয় মহিলা হইবেন।

ব্যাখ্যা—দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত উপজাতীয় মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন উপজাতির জন্য কোটা থাকিবে না।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "উপজাতীয়" শব্দটির পূর্বে "উপ-ধারা (১) (খ) তে উল্লিখিত" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বর্ণ ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৪ক) চেয়ারম্যান পদের জন্য যে কোন উপজাতীয় মহিলা, এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোন উপজাতির জন্য নির্ধারিত সদস্য পদের জন্য যে কোন উপজাতীয় মহিলা এবং উপ-ধারা (১) (গ) তে উল্লিখিত অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য যে কোন অ-উপজাতীয় মহিলা, বিধির বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন।";

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এর "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৬) কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"।

৭। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) "সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "জেলার স্থানীয় সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর "সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর "সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত কোন ব্যক্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "পরিষদের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত কোন উপজাতীয় সদস্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা।—পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকা-ভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) অন্যূন আঠার বৎসর বয়স্ক হন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং

(ঘ) রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় স্থায়ী বাসিন্দা হন।"।

১২। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) দফা (কক) রূপে সংখ্যায়িত হইবে, এবং তৎপূর্বে নিম্নরূপ দফা (ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ক) নির্বাচন এলাকা নির্ধারণ;"।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ২৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৬। পরিষদের সভায় চাকমা চীফ ও মোমাং চীফের যোগদানের অধিকার।—রাংগামাটি চাকমা চীফ এবং বান্দরবন বোমাং চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।"।

১৪। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

৩১। পরিষদের সচিব।—সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় কর্মকর্তাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৫। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ "পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দটির পরিবর্তে "অনুমোদনক্রমে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে যথা:—

"(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে বিধি অনুযায়ী সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩)এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে সরকার অন্যত্র বদলী করিতে এবং বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।"।

১৬। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩)এ "পরিবারবর্গকে" শব্দটির পর "প্রবিধান অনুযায়ী" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৭। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এ "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৮। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (১) এর "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৯। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৭(২) এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) বিধি দ্বারা দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয়।"।

 Dhaka University Institutional Repository

২০। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় পরিষদ, প্রয়োজন মনে করিলে, সেই অর্থ বৎসরের জন্য প্রণীত বা অনুমোদিত বাজেট পুনঃ প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।"।

২১। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২ক) ধারা ২৩ (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে পরিষদ এই ধারার উপ-ধারা (১) এর আওতায় নিজস্ব তহবিল হইতে বা সরকার প্রদত্ত অর্থ হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে; যথা:—

"(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।"।

২২। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

"৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়।—পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লেখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত তফসিলে নির্ধারিত সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে রয়্যালটির অংশ বিশেষ আহরণ করিতে পারিবে।"

২৩। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (২) এর "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যাকলাপের সামঞ্জস্য নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(২) সরকার যদি এইরূপ প্রমাণ পায় যে, পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কার্যক্রম এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী,

Dhaka University Institutional Repository

তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং পরিষদ উক্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সরবরাহ এবং পরামর্শ বা নির্দেশ বাস্তবায়ন করিবে।"।

২৫। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫১ ও ৫২ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ৫১ ও ৫২ বিলুপ্ত হইবে।

২৬। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "আদেশ দ্বারা, পরিষদকে, উহার মেয়াদের অবশিষ্ট কার্যকালের অনধিক কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "আদেশ দ্বারা পরিষদকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত বাতিলাদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬১তে দুইবার উল্লিখিত "সরকারের" শব্দগুলির পর উভয়স্থানে "সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৮। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "সহকারী" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলির পরিবর্তে "এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ," শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬৪ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ যে কোন জায়গা জমি, পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যাদি পরিষদ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৩) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি (Fringe land) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।"।

৩০। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাভুক্ত ভূমি বাবদ আদায়যোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদে ন্যস্ত থাকিবে এবং আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।"।

৩১। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬৭। পরিষদ ও সরকারী কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন।—পরিষদ এবং সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে, এতদ্‌বিষয়ে সরকার বা পরিষদ পরস্পরের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বা আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হইবে।"।

৩২। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।"।

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পর পরিষদের বিবেচনায় যদি উক্ত বিধি রাংগামাটি পার্বত্য জেলার জন্য কষ্টকর বা আপত্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে, পরিষদ সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনা, সংশোধন, বাতিল বা উহার প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

৩৩। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৯ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(আ) শেষে অবস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা—

"তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরিষদকে পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) বিলুপ্ত হইবে।

৩৪। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৭০ বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ৭০ বিলুপ্ত হইবে।

৩৫। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৭৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৯ এর "বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক যথাযথ" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনুযায়ী প্রতিকারমূলক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।

৩৬। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন এর প্রথম তফসিল সংশোধন।—উক্ত আইনের প্রথম তফসিল এর—

(ক) ১ নং ক্রমিকে অবস্থিত "শৃংখলা" শব্দটির পর "তত্ত্বাবধান," শব্দ ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;

"১। জেলার আইন শৃংখলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন;

১ক। পুলিশ (স্থানীয়);

১খ। উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিবরক বিরোধের বিচার;";

(খ) ক্রমিক নং ৩ এর এন্ট্রি (ঞ) এর শেষে দাঁড়ির পরিবর্তে একটি সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ট) বৃত্তিমূলক শিক্ষা;

(ঠ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা;

(ড) মাধ্যমিক শিক্ষা।";

(গ) ৬ নং ক্রমিকের এন্ট্রি (খ) এর "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; ";

(ঘ) ২১ নং ক্রমিক এবং উহাতে উল্লিখিত এন্ট্রি এর পর নিম্নরূপ ক্রমিক নং এবং এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"২২। পুলিশ (স্থানীয়)।

২৩। উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার।"

২৪। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।

২৫। কাপ্তাই হ্রদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা ও খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

২৭। যুব কল্যাণ।

২৮। স্থানীয় পর্যটন।

২৯। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

৩০। স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান।

৩১। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।

৩২। মহাজনী কারবার।

৩৩। জুম চাষ।"।

৩৭। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের দ্বিতীয় তফসিল সংশোধন।—উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসিল এর—

(ক) শিরোনামায় "টোল এবং ফিস" শব্দগুলির পরিবর্তে "টোল, ফিস এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) ক্রমিক নং ৮ এবং উহাতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮। অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফিস;

৯। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

১০। ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

১১। গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

১২। সামাজিক বিচারের ফিস;

১৩। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

১৪। খনিজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

১৫। সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

১৬। খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্র বা পাট্টা সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

১৭। ব্যবসার উপর কর;

১৮। লটারীর উপর কর;

১৯। মৎস্য ধরার উপর কর;

২০। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।"।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

রাঙ্গামাটি ঘোষণাপত্র

রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

আমরা, রাঙ্গামাটিতে ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন' শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জাতিসত্তা, সম্প্রদায় ও সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র গ্রহণ করছি, 'রাঙ্গামাটি ঘোষণাপত্র' নামে অভিহিত হবে।

আমরা -

* সম্প্রতি স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
* পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ধীরগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছি।
* পরিবেশ এবং উন্নয়ন বিষয়ক রিও সম্মেলনকে স্মরণ করছি।
* এজেন্ডা-২১ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি।
* স্মরণ করছি যে, উন্নয়নের অধিকার মৌলিক মানবাধিকারেরই অন্তর্ভুক্ত।
* আরও স্মরণ করছি যে, মানবাধিকার, শান্তি, স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

* আরও স্মরণ করছি যে, ভূমি এবং সম্পদ রক্ষার সাথে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

* আরও স্মরণ করছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের আবাসস্থল।

* উৎসাহিত যে, সরকারের বা বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীন জনগণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে।

এবং এই মর্মে আমরা, সর্বসম্মতিক্রমে, নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পেশ করছি -

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ১৯৯৭

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ১৯৯৭ এর দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উন্নয়ন সংস্থা, নীতি এবং পদ্ধতি

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উন্নয়ন কর্মসূচী আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে বাস্তবায়ন করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন বাজেট আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করা।

৪। এ অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন ব্যতীত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ না করা।

৫। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের প্রস্তাব অথবা তাদের সচেতন পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ না করা।

৬। সকল উন্নয়ন কর্মসূচী, প্রকল্প এবং পদ্ধতিসমূহ অবশ্যই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করা।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদেব নিয়ন্ত্রণে একটি উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা।

৮। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট চুক্তিকৃত সকল বিষয় দ্রুত হস্তান্তর করা।

৯। পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত এবং ভবিষ্যতে হস্তান্তরিতব্য বিষয়গুলির/সংস্থাগুলির উপর নির্ধারিত ক্ষমতা দ্রুত হস্তান্তর করা।

১০। ১৯৭৬ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে বোর্ডের কাঠামো ও কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা।

ভূমি

১১। ভবিষ্যতে গঠিতব্য ভূমি কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিবাদযুক্ত জমিতে ভূমি-ব্যবহার সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করা।

১২। পার্বত্য চট্টগ্রামের অ-বাসিন্দা ব্যক্তি বা কোম্পানীর নিকট যেসব জমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে, অথচ বে-আইনীভাবে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত রয়েছে, সে সকল জমির ইজারা বাতিল করে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

পুনর্বাসন

১৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে অদ্যাবধি যথাযথভাবে পুনর্বাসিত নয় এমন প্রত্যাগত আন্তর্জাতিক শরণার্থী এবং সকল আভ্যন্তরীণ আদিবাসী উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব ভূমি ফেরত প্রদানসহ যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা।

Dhaka University Institutional Repository

জলাশয়, পানি সম্পদ ও জীব বৈচিত্র্য

১৪। পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সাথে পূর্ব আলোচনা ও তাদের অনুমতি ব্যতীত কর্ণফুলী জলাশয় (কাপ্তাই হ্রদ)-সহ অন্য কোন জলাশয় কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট ইজারা বা বন্দোবস্তী প্রদান না করা।

১৫। সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের পরামর্শ ব্যতীত কর্ণফুলি জলাশয় (কাপ্তাই হ্রদ)-সহ অন্যান্য জলাশয় বন্দোবস্তী বা ইজারা প্রদান না করা। তবে উক্তরূপ জলাশয় বন্দোবস্তী বা ইজারা প্রদান করা হলে থাকলে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৬। কর্ণফুলি জলাশয় (কাপ্তাই হ্রদ) এলাকায় 'জলে ভাসা জমি' বা 'ফ্লিপ্ত ল্যান্ড' চাষীদের চাষাবাদের সুবিধার্থে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পরামর্শক্রমে পানির সীমা হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়াও পানির সীমা হ্রাস বৃদ্ধির নির্ধারিত ছক (রুল কার্ভ) যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং সংশ্লিষ্ট চাষীদের 'রুল কার্ভ' সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত করা।

১৭। কর্ণফুলি জলাশয় (কাপ্তাই হ্রদ) মৎস্য সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

১৮। স্থানীয় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক অস্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী আমদানি ও চাষ না করা।

বন, বনবাগান এবং জীব বৈচিত্র্য

১৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং সার্কেল চিফ ও হেডম্যানদের পরামর্শক্রমে ১৯২৭ সালের বন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

২০। প্রাকৃতিক বনের বৃক্ষনিধন এবং সেই সকল বনভূমিকে কৃষিজমিতে বা বন বাগানে রূপান্তরকরণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা। পাশাপাশি, লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের অবৈধ শিকার, হত্যা এবং পাচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।

২১। সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকাভুক্ত বনভূমিতে দীর্ঘকালীন ও স্থায়ীভাবে বসবাসরত অধিবাসীদেরকে সংশ্লিষ্ট বনজ সম্পদের আয়ের একাংশ প্রদান করা।

২২। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনায় পার্বত্য জেলা পরিষদকে সম্পৃক্ত করা।

২৩। সরকারী মালিকানাধীন বনাঞ্চল এবং বন বাগান ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে সম্পৃক্ত করা।

২৪। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে ব্যক্তি মালিকানাধীন বন বাগানের কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির আহরণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত অনুমতিপত্র প্রদানের প্রক্রিয়ার আওতামুক্ত করা।

২৫। সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকার বাহিরে অবস্থিত গ্রামীন বন (মৌজা 'রিজার্ভ' বা 'সার্ভিস' বন) সমূহকে গ্রামবাসীদের সাধারণ ও সমষ্টিগত মালিকানায় বন্দোবস্তীকৃত করা।

২৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কোন অংশকে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আওতামুক্ত না করা।

২৭। নতুন সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টি সংক্রান্ত ৮০ ও ৯০ দশকে জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বাতিল করে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে অংশীদারীত্বমূলক সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিল্প কেন্দ্রীক প্লান্টেশন সৃষ্টির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ না করে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে তাদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় প্লান্টেশন কর্মসূচী চালু করা।

২৯। স্থানীয় পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক সকল প্রকার অ-স্থানীয় প্রজাতির চারা ও বীজ রোপন ও বপন না করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। ১৯৫৭ সনের বিশ্ব শ্রম সংস্থা (ILO) এর আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিষয়ক কনভেনশন (১০৭ নং কনভেনশন) এবং জীববৈচিত্র্য চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল বনাঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী অধিবাসীদের প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা।

উদ্যান/ফল বাগান

৩১। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) দ্বারা পূর্বে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুরূপ উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফলবাগানকারীদের ভূমি, সহজ শর্তে ঋণ, কারিগরী সাহায্য এবং অন্যান্য প্রায়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

খনিজ সম্পদ

৩২। খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান এবং উত্তোলন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে সম্পাদন করা। এছাড়া, যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না হয় তা নিশ্চিত করা।

৩৩। খনিজ সম্প্র অনুসন্ধান বা উত্তোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ সকল ব্যক্তিকে ভূমি এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা।

৩৪। খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের চুক্তির শর্তাদি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করা।

৩৫। খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগে স্থানীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

পরিবেশ

৩৬। স্থানীয় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক বন নিধন, চাষাবাদ, পর্যটন ও অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ ও নিষিদ্ধ করা।

৩৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের বন উজাড় এবং ভূমিক্ষয় রোধের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের নদী, হ্রদ, ঝর্ণা ও অন্যান্য জলাশয়গুলোতে পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও এর ব্যবহার

৩৯। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪০। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ঐতিহ্যবাহী নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক ও কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ মহিলা

৪১। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ প্রদান করা।

৪২। দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

নারী

৪৩। নারীদের প্রতি সকল প্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করা।

৪৪। সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তার সাথে সম্মতিক্রমে নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংশোধন করা।

৪৫। পাঠ্যসূচীতে নারীদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

স্বাস্থ্য

৪৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ কর্মসূচী পুনরায় চালু করা।

৪৭। পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় জনবল এবং যন্ত্রপাতি প্রদান করা।

৪৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাহিরে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী সংস্থায় কর্মরত ডাক্তার যারা পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলী করা।

৪৯। যেসব আদিবাসী ছাত্র সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তির সুযোগ পাবে তাদেরকে 'উপজাতীয়' কোটায় অন্তর্ভুক্ত না করা।

৫০। আদিবাসী এবং স্থায়ীভাবে বসবাসরত অধিবাসীদের জন্য কোটা নিশ্চিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা।

৫১। প্রসূতি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে মৌজা ভিত্তিক কমপক্ষে একজন করে পল্লী চিকিৎসক ও দাই নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫২। এ্যালোপেথিক চিকিৎসার পাশাপাশি আদিবাসী এবং অন্যান্য বনজ ঔষধ ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি প্রদান করা।

শিক্ষা

৫৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আদিবাসী জাতিদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও প্রয়োজনে নিয়োগ দানের শর্ত শিথিল করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সম্প্রদায়ের ভাষাভাষী স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ দান করা।

৫৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা।

৫৬। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।

৫৭। অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ বঞ্চিত আদিবাসী জাতি অধ্যুষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যালয় স্থাপন করা।

৫৮। উচ্চশিক্ষায় অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ বঞ্চিত আদিবাসী জাতির সদস্যদের জন্য আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৫৯। গ্রামীন জনগোষ্ঠি কর্তৃক পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা।

৬০। রেজিষ্ট্রিকৃত বেসরকারী কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬১। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা।
৬২। পার্বত্য চট্টগ্রামে বি. এড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।
৬৩। রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিষয় ভিত্তিক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর কোর্স পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করা এবং বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।
৬৪। মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর সম্পৃক্ততা বাতিল করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কোটা পদ্ধতিতে আদিবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের ভর্তি নিশ্চিত করবে।
৬৫। মেডিক্যাল, প্রকৌশল, কৃষিসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী পাহাড়ীদের নির্ধারিত কোটা বৃদ্ধি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য আলাদাভাবে কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যাপ্ত আসন সংরক্ষণ করা।
৬৬। আদিবাসী পাহাড়ী ছাত্র ও ছাত্রীদের আবাসের জন্য প্রতিষ্ঠিত তিন পার্বত্য জেলা সদরের ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসসমূহকে পুনরায় চালু করে প্রয়োজনানুসারে নতুন ছাত্র ও ছাত্রীবাস প্রতিষ্ঠা করা।
৬৭। প্রাথমি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা সদরে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) প্রতিষ্ঠা করা।

ভাষা ও সংস্কৃতি

৬৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা পাঠ্যসূচীতে আদিবাসী জাতিসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত করা।
৬৯। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতি সমূহের ভাষা অত্রাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
৭০। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা পাঠক্রমে যেসব ভুল ও অসম্মানজনক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধির সাথে যথাযথ পরামর্শক্রমে সংশোধন করা।

তথ্য ও উপাত্ত

৭১। সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড ও কার্যক্রম প্রক্রিয়া সম্পর্কে সর্বসাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত পৌঁছানো নিশ্চিত করা। অনুরূপভাবে অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ক্রীড়া

৭২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব হস্তান্তর করা।
৭৩। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও

৭৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সকল এনজিও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ব্যতীত এনজিওদের ঋণদান কর্মসূচী পরিচালনা করা।

৭৬। এনজিওদের ঋণদান কার্যক্রমে সুদ এবং সার্ভিস চার্জের হার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন দ্বারা নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘন না করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী এনজিও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

৭৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৭৯। পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত সকল এনজিওদের বিভিন্ন স্তরে লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাঁচ দফা দাবিনামা

১. সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে।
(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে।
(খ) বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে অন্যত্র সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে।
(গ) বান্দরবানে নতুন সেনানিবাস তৈরীর জন্য ৫৪ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

৩. (ক) ভারত থেকে প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও স্ব স্ব জায়গা জমি ফেরত দিতে হবে।
(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
(গ) আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে হবে।
(ঘ) কাপ্তাই লেকের নির্দিষ্ট জলসীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং চাষের মৌসুমে প্রয়োজনমত পানি কমাতে হবে।

৪. (ক) সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
(খ) সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
(গ) বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বিসিএসসহ অন্যান্য চাকরীর ক্ষেত্রে পাহাড়িদের কোটা বৃদ্ধি করতে হবে।
(ঘ) মেডিক্যাল, বিআইটি ও কৃষি কলেজসমূহের কোটা সেনা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে মেধাক্রমানুসারে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করাতে হবে।

৫. (ক) এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে এবং সকল গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
(খ) পার্বত্য আপোষচুক্তির পর এ যাবত পুলিশ ও জেএসএস সন্ত্রাসীদের হতে ইউপিডিএফ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মি, সমর্থকদের খুনের বিচার ও জেএসএস-এর অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে হবে।
(গ) ইউপিডিএফ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মিদের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও আটককৃত নেতাকর্মিদের মুক্তি দিতে হবে।

পিসিপি দশম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে (২১-২২ মে, ২০০০-এ অনুষ্ঠিত) সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম এর উপর বই এবং প্রবন্ধ ঃ

1. Ahmed Aftab, Ethnicity and Insurgency in the Chittagon Hil Tracts Region., A study of the crisis of political Integration in Bangladesh. Journal of Common Wealth and comparative polities, Vol-3, No.-3, 1993.
2. Ahmed Emajuddin- Foreign Policy of Bangladesh. A Small States Imperative UPL, Dhaka-1984.
3. Ahmed Emajuddin - Military Rule and Myth of Democracy, UPL, Dhaka-1988,
4. Ahmed Imtiaz- Security Issue in South Asia- U.S. Relations. New conflict, New Begining, BIISS Journal., Vol.-21, No.-4, 2000.
5. Ahsan. Syed. Azizul and Bhumitra Chakma- Problems of National Integration in Bangladesh. The Chittagong Hill Tracts. Asian Survey. Vol.-29, No.-10, California-1989.
6. Alam S.M and Akhtar- R- Problem of Ethnic Identity and National Integration A case study from Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. The Jahangirnagor Review, 1990.
7. Ali Syed Mahamood- The Fearful State Power, People and Internal War in South Asia. ZED Books, London and New Jersy, 1993 .
8. Ali Syed Murtaza-The Hitch in the Hills Published by Monewara Begum, Chittagong-1996.
9. Amin Md. Nurul- Sessionist Movement in the Chittagong Hil tracts., Vol.- VII, No.-1, Islamabad 1988/89
10. Ayub Mahammod- Security in the Third World. The warm about to turn in International Affairs (London), Vol-60, No.-1, 1983/84.

Dhaka University Institutional Repository

11. Bangladesh : A Brief Account of Tribal Victims of the Bangladesh Government Direct Violence. Based on a report sent from the Chittagong Hill Tracts, I.W.G.I.A, Oct. 1985.
12. Barakat Abul and Huda Shamsul- Politico Economic Essence of Ethnic Conflict in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Social Science Review, Vol.- 5, No.-2, Dhaka University-1988.
13. B.B.S. Statistical pocket book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh, 1988, 1991 and 1996.
14. Belal Khaled- The CHT Falconry in the Hills, Chittagong-1992.
15. Bhaumik Subir, Insurgent Crossfire : North-East India, Lancer Publishers, PVT Ltd., New Delhi-1996.
16. Bishwas Ashok, A-Raw's Role in Furthering India's Foreign Policy. Institution of the Strategic Studies. Delhi. The New Nation 31, August 1994.
17. Chakrabattri, Ratanlal- Chakma Resistence to Early British Rule, Bangladesh Historical Studies, Part-2, 1997.
18. Chittagong Hill tracts Development Board Ordinance, 1996 (Ordinance No.- LXXVII)
19. Chittagong Hill Tracts Development Study Socio-Economic Impact of Roads and Economic Appraisals-August 1977.
20. Chowdhury Nilufar- Sino Indian Quest for Rapprochment. Implication for South Asia. BIISS Paper No.-9, 1989.
21. Gupta Bhabani Sen, South Asian Perspective Seven Nations in Conflict and Co-operation B.R Publishing Corporation, Delhi-1988.
22. Ghosh, Partha, S-Co-operation and Conflict in South Asia. UPL, Dhaka-1989.
23. Quder Ghulam, The Challenge of Security and Development. A view from Bangladesh. BIISS Journal, Vol.-15, No.-3, 1996.

Dhaka University Institutional Repository

24. Hafiz. Md. Abdul- South Asias security Extra Regional inputs. BIISS Journal, Vol.- 10, No.-2, 1989.

25. Huq Muhammad-Mufazzalul-Government Institutions and Underdevelopment. A study of the tribal peoples of the Chittagong Hill Tracts. Center for Social Studies, February-2000, Dhaka.

26. Hossain Syed Anwar, Religion and Ethnicity in Bangladesh Politics, BIISS Journal Vol.-12, No.-4, 1991.

27. Hossain, H- Geo-Politics and Bangladesh Foreign Policy, C.L.I.O. Journal, Dhaka-1989.

28. Hutchinson R.H.S. An Account of the Chittagong Hill Tracts, Calcutta, 1906.

29. Ibrahim Syed Muhammad- Insurgency and Counter Insurgency. The Bangladesh Experience in Regional Perspective- The CHT military paper. Issue No.-4, AHQMTDTE, Dhaka- 1991.

30. Irshad Asheque- Indian Military Power and Policy BIISS Journal Vol.-10, No.-10, 1989.

31. Islam Syed Nazmul. The Chittagong Hill Tracts in Bangladesh. Internal Crisis Between Centre and Periphery. Asian Survey, Vol-21, No.-12, December-1981.

32. Islam Syed Nazrul- The Karnafuli Project. Its impact on the tribal Population. Public Administration Deptt. Dhaka University Vol.-3, No.-2, 1978.

33. Karim Aminul- Power Politics in the Indian Ocean region after The Cold War, BIISS Journal, Vol-16, No.- 4, 1996.

34. Kalam Abul-Chinese Foreign Policy and Security Perceptions. BIISS Journal, Vol-17, No.-2, 1996.

35. Karim A.I. Security of Small States. Security of Small State in the South Asian Context.

Dhaka University Institutional Repository

36. Mohapatra Srikanta- National Security and Armed Forces in Bangladesh. Strategic Analysis. Delhi, August 1991.

37. Mohsin Amena- The Politics of Nationalism: The case of the Chittagong Hill tracts UPL. Dhaka-1997.

38. Mohsin Amena and Ahmed Imtiaz- Modernity Alienation and the Environment. The Experience of the Hill People. Journal of the Asiatic Society, Dhaka-1996.

39. Mohsin Amena- Military Hegemony and the Chittagong Tracts. Journal of Social Studies, Vol.-72, 1996.

40. Mohsin Amena- The Chittagong Hill Tracts Peace Accord. Looking Ahead. The Journal of Social Studies. August- September-1998 University of Dhaka.

41. Mohsin Amena- Bangladesh India Relations. Limitations and Options in Emazuddin Ahmed and Abul Kalam (eds) Bangladesh South Asia and The World. Academic Publishers. Dhaka-1992.

42. Montu Kazi- Tribal Insergency in Chittgont Hill Tracts, Economic and Political Weekly (Mobby) 1981.

43. Moniruzzaman Talukdar- The Future of Bangladesh in a Jayaratnan Wilson and Denis Dalton (eds) The States of South Asia Problem of National Integrtion (Vikas Publishing House) New Delhi 1982.

44. Moniruzzaman Talukder- Bangladesh in 1975, The Fall of Muzibur Rahman and its aftermath, Asian Survey, Feb-1976.

45. Moniruzzaman Talukdar- Bangladesh in 1976, Straguale for Survival as an Independent State. Asian Survey, Vol-17, No.-2, 1977.

46. Nuruzzaman Md. National Security of Bangladesh. BIISS Journal, Vol.- 12, No.-3. 1991.

47. Pradhan Pradyat- Indian Security Environment in the 1990s. External Division. Analysis, Delhi, September, 1989.

Dhaka University Institutional Repository

48. Rob M.A- Resource Potentials and Geopolitical Significance of the Cittagong Hill Tracts of Bangladesh, Seminar Paper Presented at A.M.U.G.S. Aligarh, 1991, India.

49. Raina Ashaka Inside RAW অনুবাদ লেঃ (অবঃ) আবু রুশদ মিলারস প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৩।

50. Roy Raja Devasish & Others- The Chittagong Hill Tracts life and Nature at Risk, Center for Environment and Development Study, Dhaka, July-2002.

51. Shelly Mizanur Rahman- The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. The Untold Story, Centre for Development Research, Dhaka-1992.

52. Sheik Javeed Ahmed-Security Perspections of Weak Nations. A case study of Pakistan in Syed Farooq Hasnat and Anton Peliska (eds) Security for the Weak Nations : A Multiple perspective, Lahore-1986.

53. The CHT Commission, Life is not Ours. Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Netherland 1991, 1992, 1994 and 2000.

বাংলা ভাষা প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বই এবং নিবন্ধ ঃ

১. আমিন মু নুরুল — পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪২, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২.

২. আমিন মু নুরুল ও অন্যান্য- পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতিয়দের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন ঃ একটি মার্কসীর পর্যালোচনা। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ সাল।

৩. আবেদিন জয়নাল- পার্বত্য চট্টগ্রাম, সরূপ সন্ধান প্রকাশিকা আমেনা বেগম, ঢাকা-১৯৯৭।

৪. আলম নুহ-উল, লেনিন- পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্মুখে শান্তি পারাবার, হাক্কানি পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৯৯.

৫. আজাদ হুমায়ুন- পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হিংস্যার ঝরনা ধারা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৭.

৬. আজাদ সালাম শান্তি বাহিনি ও শান্তি চুক্তি, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইব্রাহীম সৈয়দ মুহাম্মদ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০১।

৮. কালাম আবুল- বাংলাদেশের নিরাপত্তা, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত, নিবন্ধমালা দশম খন্ড, মার্চ-২০০০, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র।

৯. কামরুজামান, এম.- পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট, জাতীয়তা ও সংহতি, প্রাক্টিক জার্নাল ১৯৮৬।

১০. কামাল মেসবাহ ও মৃধা শারমিন- পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট ও সম্ভাবনা। গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ, ২ ডিসেম্বর, ঢাকা-২০০১।

১১. চাকমা, সুগত- পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি রাঙ্গামাটি- ১৯৯৩.

১২. চাকমা সন্ধার্থ- প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম মল্লিকপুর কলকাতা, ১৯৮৫.

১৩. চাকমা সিদ্ধার্থ- প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাথ ব্রাদার্স কলকাতা-১৯৮৬.

১৪. চাকমা সুনীতি বিকাশ- প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। চট্টগ্রাম-১৯৯১।

১৫. চাকমা জ্ঞানেন্দু বিকাশ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, স্থানীয় সরকার পরিষদ,রাঙ্গামাটি-১৯৯১।

১৬. চাকমা বিপ্লব- পার্বত্য চট্টগ্রামঃ স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৯৭।

১৭. বসু সজল- আঞ্চলিক আন্দোলন, অর্পনা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স- কলকাতা-১৯৯০.

১৮. বরেন ত্রিপুরা- ত্রিপুরা জাতি- সাপ্তাহিক পার্বতী, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯০।

১৯. মনিরুজ্জামান তালুকদার- বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, মার্চ-২০০০।

২০. মিয়া মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম-সাময়িক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কাকলী প্রকাশনী- ২০০০।

২১. রহমান আতিকুর- প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট। রাঙ্গামাটি প্রকাশনী, রাঙ্গামটি-১৯৯৭।

২২. রহমান মাহবুবুর- বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার সমস্যা, BIISS Paper No- 12, 1990.

২৩. রব মোহাম্মদ আব্দুর- বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতি কয়েকটি সাম্প্রতিক সমস্যা, আদিঙ্কা প্রকাশনী,ঢাকা ১৯৯৯।

২৪. রুশদ আবু লেঃ (অবঃ) পার্বত্য চট্টগ্রামশান্তি বাহিনী ও মানবাধিকার জেড আর প্রকাশনী, এপ্রিল,ঢাকা ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৫.সৈয়দ আনোয়ার হোসনে বাংলাদেশ ১৯৯৬, রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

২৬.হোসেন সৈয়দ আনোয়ার শান্তি অশান্তির দোলাচলে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাপ্তাহিক বিচিত্রা সংখ্যা-২৬, ১৯৯০ ইং।

২৭.হোসেন সৈয়দা আনোয়ার শান্তি অশান্তির দোলাচলে পার্বত্য চট্টগ্রাম, আহা পার্বত্য আহা চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক গ্রন্থ। অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ, ১৯৯৭।

২৮.হোসেন সৈয়দ আনোয়ার, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও সমাধান সাপ্তাহিক একতা ১ মার্চ ১৯৯১ (১০ ফেব্রুয়ারি ডাকসু ও গণতান্ত্রিক ফোরাম আয়োজিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও সমাধান শীর্ষক" সেমিনার সভাপতির ভাষন হিসেবে পঠিত।

জাতীয় সংবাদপত্র সমূহ

দৈনিক ইত্তেফাক

১. ৮ নভেম্বর ১৯৯৭

২. ৭ আগস্ট-১৯৯৭

৩. ২ নভেম্বর ১৯৯৬

৪. ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

৫. ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

৬. ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

৭. ১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৮. ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৯. ১১ জুন ১৯৯৭

১০.১৬ জুলাই ১৯৯৭

১১.২০ জুলাই ১৯৯৭

১২.৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

১৩.৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

১৪.১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক আজকের কাগজ

১. ৪ মার্চ ১৯৯৭

২. ৬ মার্চ ১৯৯৭

৩. ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৪. ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৭

৫. ২৬ জানুয়ারী ১৯৯৭

৬. ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

৭. ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

৮. ৬ মার্চ ১৯৯৭

৯. ১০ মার্চ ১৯৯৭

১০.৬ এপ্রিল ১৯৯৭

১১. ২২ মে ১৯৯৭

১২. ২ এপ্রিল ১৯৯৭

১৩. ১৩ মার্চ ১৯৯৭

১৪. ১১ মে ১৯৯৭

১৫. ১৩ মে ১৯৯৭

১৬. ১৬ মে ১৯৯৭

১৭. ৩১ মে ১৯৯৭

১৮. ২৩ জুলাই ১৯৯৭

১৯. ৭ আগস্ট ১৯৯৭

২০. ৮ আগস্ট ১৯৯৭

২১. ১০ আগস্ট ১৯৯৭

২২. ১১ আগস্ট ১৯৯৭

২৩. ১৬ জুলাই ১৯৯৭

২৪. ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

২৫. ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

২৬. ২৮ নভেম্বর ১৯৯৭

২৭. ২৯ জুলাই ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইনকিলাব

১. ১২ ডিসেম্বর ২০০০

২. ১১ নভেম্বর ১৯৮৯

৩. ১৩ নভেম্বর ১৯৮৯

৪. ১৩ অক্টোবর ২০০০

৫. ১৪ অক্টোবর ২০০০

৬. ১১ অক্টোবর ২০০০

৭. ১৬ অক্টোবর ২০০০

৮. ১৫ অক্টোবর ২০০০

৯. ১২ অক্টোবর ২০০০

১০. ১৫ আগস্ট ১৯৯৭

১১. ১৯ জানুয়ারী ১৯৯৩

১২. ১৩ মার্চ ১৯৯৭

১৩. ১৪ মার্চ ১৯৯৭

১৪. ২৫ জানুয়ারী ১৯৯৭

১৫. ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

১৬. ১২ নভেম্বর ১৯৯৭

১৭. ৩০ নভেম্বর ১৯৯৭

সাপ্তাহিক বিচিত্রা

১. ১৭ জানুয়ারী ১৯৯৭

২. ২৪ জানুয়ারী ১৯৯৭

৩. ২১ মার্চ ১৯৯৭

৪. ১৪ মার্চ ১৯৯৭

৫. ৪ জুলাই ১৯৯৭

৬. ২১ মার্চ ১৯৯৭

৭. ৩০ মে ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৮. ১০ জুলাই ১৯৯৭

৯. ৪ জুলাই ১৯৯৭

১০. ১৫ আগস্ট ১৯৯৭

১১. ২৫ জুলাই ১৯৯৭

১২. ২৬ অক্টোবর ১৯৯৭

১৩. ১৪ মার্চ ১৯৯৭

১৪. ৩ মে ১৯৯৭

Weekly Holiday

1. 20 February 1998
2. 27 February 1998
3. 5 September 1997
4. 25 July 1997
5. 12 December 1997.

The New Nation

1. 1 October 1991
2. 24 August 1997

The Daily Star

1. 18 Septermber 1997
2. 16 November 1997
3. 5 December 1997
4. 19 December 1997
5. 4 January 1997
6. 11 January 1997
7. 13 January 1997
8. 14 July 1997

Dhaka University Institutional Repository

9. 16 July 1997

10.5 August 1997

11.3 January 1998.

দৈনিক প্রথম আলো

১। ১৬ এপ্রিল- ২০০০

২। ৪ জুন ২০০১

ভোরের কাগজ

৬ মার্চ ১৯৯৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

১। ২ এপ্রিল ১৯৯৬

২। ২২ নভেম্বর ১৯৯৭

৩। ৭ নভেম্বর ১৯৯৮

দৈনিক দিনকাল

১। ১০ মে ১৯৯৭

২। ২৩ এপ্রিল ১৯৯৭

সংগ্রাম

৯ আগস্ট-৯৭

২৯ জুন-৯৭

সাপ্তাহিক রোববার

২০ বছরে রোববার, প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭।